KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫/- ৫/- ৫/-	Year of Publication : মাঘ, ১৩৬৪ ফাল্গুন, ১৩৬৪ চৈত্র, ১৩৬৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No.: KLMLGK

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এ্যাষ্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ
কার্যালয়ে পাওয়া যাইতেছে।

৮, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৯

	বই-এর নাম	লেখক
১।	রাশি ও লগ্ন বিজ্ঞান রহস্য	—পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
২।	হাতের রেখায় জীবন রহস্য	—ডঃ গৌরাঙ্গপ্রসাদ শাস্ত্রী (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড
৩।	Expression & Language of the Unconscious	—Sri Sabyasach
৪।	নতুন দৃষ্টিকোণে গ্রহ নক্ষত্র ও সাব	—শ্রীসব্যসাচী
৫।	নাড়ী জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ রহস্য	—শ্রীবিষ্ণুদাস জ্যোতিঃশাস্ত্রী
৬।	জ্যোতিষী শিক্ষা	—শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্মা (১ম,২য়,৩য়,৪র্থ,৫ম খণ্ড) প্রতি খণ্ড ১০·০০
৭।	Jyotish Sanchayan	
৮।	Questions in Jyotisnatak Examination (1975-85) and Hints Answer	—Viswanath Deva Sarma
৯।	বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ	—শ্রীউৎপল চক্রবর্তী
১০।	Table of Ascendants & Ephemeris	—By N. C. Lahiri
১১।	লঘুজাতকম্	—অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য
১২।	বৃহৎজাতকম্	—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
১৩।	জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ	—১ম ও ২য়, প্রতি খণ্ড
	ঐ	৩য় খণ্ড
১৪।	গ্রহের দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল	ডাঃ রণতোষ সাহা
১৫।	ফলদীপিকা	—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
১৬।	ভারতীয় সাহিত্যে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ	—ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়
১৭।	জ্যোতিষতত্ত্ব সংকেত ও বিশ্লেষণ	—শ্রীমলয় রায়
১৮।	মিথ্যা নয়, সত্য	—প্রীতি রায়
১৯।	গ্রহের ভাবপতির দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল	—ডাঃ রণতোষ সাহা

ভি পি তে পুস্তক পাঠানো হয়ে থাকে। ডাক ব্যয় বাবদ ১·০০ ও পুস্তকের অর্ধ মূল্য অগ্রি

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

= সম্পাদক =

= সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর = আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

পঞ্চম বর্ষ মাঘ ১৩৬৪

বিপদ সঙ্কেতের শিকল টানলে

প্রতিক্রিয়া বহুদূর গড়ায়

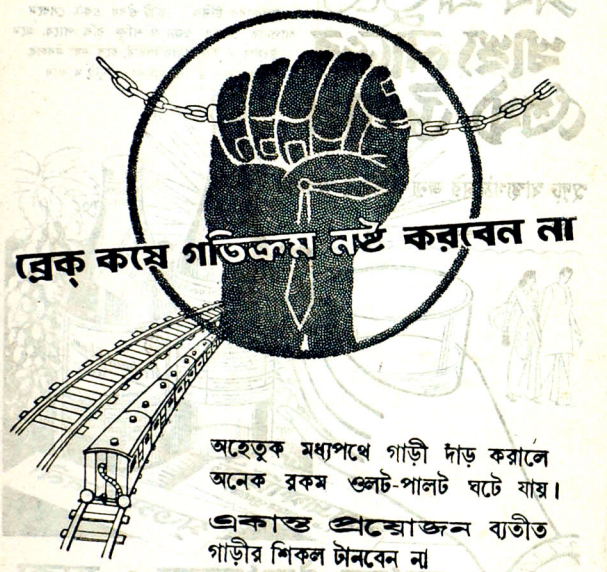

ব্রেক্ কষে গতিক্রম নষ্ট করবেন না

অহেতুক মধ্যপথে গাড়ী দাঁড় করালে
অনেক রকম ওলট-পালট ঘটে যায়।

একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত
গাড়ীর শিকল টানবেন না

দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃক প্রচারিত

সমকালীন

পঞ্চম বর্ষ : মাঘ ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

প্র ব ন্ধ ॥ ইংরেজী কেন কোথায় কতদূর : অন্নদাশঙ্কর রায় ৬০৫
কালিদাসের কাব্যে ফুল : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬১৫
অ নু স্মৃ তি ॥ সান্নিধ্য : চিন্তামণি কর ৬০৯
গ ল্প ॥ কমলাদি' : প্রকাশ পাল ৬২৫
উ প ন্যা স ॥ এক ছিল কন্যা : স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২৯
ক বি তা ॥ তবে বল : সঞ্জয় মজুমদার ৬৩৭
জোয়ার : সন্তোষকুমার অধিকারী ৬৩৮
আ লো চ না ॥ আণবিক অস্ত্র ও বিশ্বসংকট : সনৎকুমার রায়চৌধুরী ৬৩৯
স মা জ স ম স্যা ॥ উন্মাসিকতা প্রসঙ্গে : সুব্রতেশ ঘোষ ৬৪২
স মা লো চ না ॥ নিউ ক্লাস : অমলেন্দু দাশগুপ্ত ৬৪৬
সেপ্টিনারী সুভেনীর অব্ দি ওয়ার অব্ ইণ্ডিপেনডেন্স্ : উৎপল চৌধুরী ৬৪৯
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি—গ্রহে উপগ্রহে—দূরকে করিল নিকট বন্ধু—ব্যঞ্জনা ও কাব্য—
বাংলা নাটক : নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৬৫০

সম্পাদক
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

ইতিহাস ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল্য ২·৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩·০০
"রবীন্দ্রনাথের আজীবন ইতিহাস-সংসৃষ্ট বিষয়ে লেখাগুলি একত্র করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত। কবিগুরু ভারতের অতীতকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা এই সংগ্রহে অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই বইখানি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার জন্য ব্যাকুল ভক্তদের চিরসঙ্গী হইয়া থাকিবে। আর, পেশাদার ঐতিহাসিকগণও ইহার মধ্য হইতে অনেক অমূল্য চিন্তারত্ন আত্মসাৎ করিতে পারিবেন।" —শ্রীযদুনাথ সরকার। প্রবাসী

পূজাপার্বণ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মূল্য ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·০০
"ভারতীয় সংস্কৃতির এবং আমাদের সমাজের আচার ও অনুষ্ঠানপদ্ধতির প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীনতা গ্রন্থকার যেভাবে প্রতিপাদিত করিয়াছেন তাহা সকলকে চমৎকৃত করিবেই।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মূল্য ২·৩০
"লেখক একাধিকবার নানা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণকালে ভিন্ন ভিন্ন বহুভাষী দেশের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার ফলে তিনি ভারতীয় ভাষা-সমস্যার ব্যাপারে অনেক কেজো নির্দেশ দিতে পেরেছেন। এ সকল নির্দেশ কাজে পরিণত করলে আমাদের জাতীয় ভাষাসমস্যার সমাধান অনেকটা সহজ হবে।" —কবিতা

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ॥ সুরেন ঠাকুর মূল্য ২·০০
"বইখানির অপর নাম একেলে কথকতা। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যাঁদের কৌতূহল আছে—তাঁদের এই বই পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।" —পরিচয়

বাংলা উপন্যাস ॥ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্য ২·০০
"বইখানি বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হিসাবে সুখপাঠ্য ও মূল্যবান হইয়াছে।" —যুগান্তর

বাংলা সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মূল্য ১·৫০
"সাহিত্যের ইতিহাসে সাল-তারিখের জটিলতার পথ পরিত্যাগ করিয়া লেখক যে সাহিত্যের কথা মাত্র বলিয়া গিয়াছেন তাহার ফলে এই ইতিহাস সাহিত্যের মতই সরস ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।" —পরিচয়

পদার্থবিদ্যার নবযুগ ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মূল্য ৩·০০
"বর্তমান পদার্থবিদ্যা যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তার বিষয়ে গল্পের বই লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু এ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে বাংলায় আলোচনা করা সাহসের কাজ। এ চেষ্টায় বর্তমান গ্রন্থকার সফলকাম হয়েছেন।" —দেশ

ভারত-দর্শনসার ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মূল্য ৩·৩০
"অতি সরল ভাবে লেখা। ইহার প্রত্যেক ছত্রে আমরা গ্রন্থকারের পরিচয় পাই, তাঁহার নিজের চিন্তাধারার সন্ধান পাই। এরূপ না হইলে গ্রন্থ কখনও চিত্তাকর্ষক বা হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না এবং পাঠকের মধ্যে চিন্তার উন্মেষসাধন করিতে সক্ষম হয় না।" —উত্তরা

প্রাণতত্ত্ব ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল্য ২·৩০
"এই বইটিতে নানা তথ্য এত সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, অল্পবিদ্য লোকেরও বুঝতে বাধা হবে না এবং জীববিদ্যার একটা মোটামুটি ধারণা অনায়াসে হতে পারবে।" —দেশ

হিউএনচাঙ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু মূল্য ৩·০০
"পুস্তকখানি যেমন তথ্যবহুল তেমনি উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক।" —শিক্ষক

বিশ্বভারতী • ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

ইংরেজী কেন কোথায় কতদূর

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমরা কোন দেশের মানুষ? ভারতের। কোন যুগের মানুষ? বিংশ শতাব্দীর। দেশ আর যুগ দুই আমাদের কাছে সত্য। পার্থীর কাছে যেমন নীড় আর আকাশ। এর একটাকে একান্ত করে যারা দেখে তারা দেশপ্রেমিক হতে পারে, কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষ নয়। তারা ও আমরা দুই স্বতন্ত্র যুগের সন্তান। অথবা তারা যুগধর্মী হতে পারে, কিন্তু তারা ভারতের ঘরের ছেলে নয়। তারা ও আমরা পরের ছেলে ও ঘরের ছেলে।

দেশ ও যুগ দুই আমাদের কাছে সত্য। দেশ বলতে বোঝায় দেশের জন, দেশের মন। দেশের দশ জনের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাই, দেশের মন জানতে চাই, সেইজন্যে শিখি দেশভাষা—বাংলা হিন্দী তামিল মারাঠী ইত্যাদি। তেমনি যুগ বলতে বোঝায় যুগের জ্ঞান, যুগের ধ্যান, যুগের কর্ম, যুগের ধর্ম। যুগের সঙ্গে তাল রাখতে চাই, পা ফেলতে চাই, সেই-জন্যে শিখি এ যুগের সব চেয়ে অগ্রসর ভাষা—ইংরেজী ফরাসী জার্মান রাশিয়ান ইত্যাদি। অর্থাৎ দেশের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যে একপ্রস্থ ভাষা, যুগের সঙ্গে অভিন্ন হবার জন্যে আরেক প্রস্থ ভাষা।

কিন্তু মানুষের আয়ু পরিমিত। ভাষাশিক্ষাও সহজ নয়। সেইজন্যে দুই প্রস্থ ভাষাকে কমিয়ে এনে দুটিতে দাঁড় করাতে হয়। ইচ্ছাসত্ত্বেও আমি হিন্দী বেশী দূর পড়িনি, ফরাসী আরম্ভ করে ছেড়ে দিয়েছি। ওড়িশায় জন্ম, তাই ওড়িয়া জানি। আর জানি কিছু সংস্কৃত। কিন্তু হাতে অন্য কাজ না থাকলে আমি হিন্দী ও ফরাসী ভালো করে শিখতুম। দেশের মন যুগের ধ্যান তা হলে আমার কাছে আরো পরিষ্কার হতো। বিজ্ঞানের দিকে যাঁদের ঝোঁক জার্মান বা রাশিয়ান তাঁদের শিখতেই হবে। তেমনি দক্ষিণ ভারতকে চিনতে হলে তামিল তেলেগু অপরিহার্য। আর দক্ষিণ ভারতকে না চিনলে ভারতকেও সমাক চেনা যায় না, যেমন বিজ্ঞান না জানলে বিংশ শতাব্দীকেও ঠিকমতো বোঝা যায় না।

অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীকে সময়ের অভাবে ও কাজকর্মের চাপে দুটিমাত্র ভাষাকেই অবশ্য শিক্ষণীয় বলে গ্রহণ করতে হবে। একটি তো মাতৃভাষা। অপরটি ইংরেজী। দুটির কমে কিছুতেই চলবে না। নয়তো শিক্ষিত মহলে সমানভাবে চলাফেরা করা অসম্ভব হবে।

শিক্ষিত ভারতীয়মাত্রেই দ্বিভাষী। স্বভাষী তথা ইংরেজীভাষী। যাঁরা ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীর বিধান দিচ্ছেন তাঁরাও প্রকারান্তরে স্বীকার করছেন যে শিক্ষিত ভারতীয়মাত্রেই দ্বিভাষী। কিন্তু তাঁরা বুঝেও বুঝছেন না যে ইংরেজী আমরা এত কষ্ট করে শিখি যুগের সঙ্গে যোগ রাখার জন্যেই, যুগসাগরে সাঁতার কাটার জন্যেই। ইংরেজীর অভাব হিন্দীকে দিয়ে পূরণ হতে পারে না। হিন্দী ও ইংরেজী এক পর্যায়ের ভাষা নয়। হিন্দী আমাদের অন্যতম দেশভাষা। আর ইংরেজী আমাদের অগ্রগণ্য যুগভাষা। হিন্দীকে যুগভাষা পর্যায়ের ভাষা বলবে না কেউ। এ যুগের অগ্রসর চিন্তার সঙ্গে ওর যা কারবার তা উৎপাদকের নয়, আমদানিকারকের। ইংরেজী থেকে তর্জমা না করলে আধুনিক বলতে ওর তেমন কিছু নেই। আমরা সোজা ইংরেজীর কারখানায় না গিয়ে হিন্দীর আড়তে যাব কেন? এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা না পড়ে হিন্দী বিশ্বকোষ পড়তে চাইব কেন? তার চেয়ে বাংলা বিশ্বকোষ পড়লে সময় আরো বাঁচে। সময় মানে আয়ু। আয়ুর অপচয় করতে নেই।

যুগের সঙ্গে যোগ রাখতে হলে, পা ফেলতে হলে, রেস দিতে হলে ইংরেজী শিখতে হবেই। হিন্দী এর বিকল্প নয়। বাংলাও নয়। সুতরাং যারা ইংরেজী শিখবে না তারা অর্ধশিক্ষিত বলেই গণ্য হবে। হোক না কেন বাংলায় পণ্ডিত, অধিকন্তু হিন্দীতে বিদগ্ধ। সে যুগ আর নেই যে যুগে ইংরেজী না জানলেও শিক্ষিত মহলে মান পাওয়া যেত। সে যুগ আর ফিরবেও না কোনো দিন। অপর পক্ষে যারা শুধু ইংরেজীটাই মন দিয়ে শেখে, মাতৃভাষার ধনদৌলতের খোঁজ রাখে না, তারাও অর্ধশিক্ষিত। ইংরেজ আমলে তারা সাহেবদের সঙ্গে সাহেব হয়ে মান পেয়েছে বলে এখনো পাবে? তা হবার নয়। তাদেরও শিক্ষা বাকী আছে। দেশের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে যুগের সঙ্গে অভিন্ন হতে যাওয়া বৃথা। জনগণের মন পেতে হবে। তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তারা পেছিয়ে থাকবে আর আমি একা এগিয়ে যাব এর নাম প্রগতি নয়। আমার কাছে আধুনিকতা ও সার্বজনিকতা এক ও অবিভাজ্য। দেশকে আধুনিক করতে হবে, আধুনিককে দেশীয় করতে হবে। মাতৃভাষা ও ইংরেজীভাষা দুই আমাদের কাছে হবে মূল্যবান।

তবে সমান মূল্যবান নয়। কারণ ইংরেজী থেকে অনেককিছুই আমরা বাংলায় চালান দিতে পারি। জাপানীদের মতো উঠে পড়ে লাগলে প্রত্যেকটি ইংরেজী বই, ভালো বই, সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তর্জমা করা যায়। জাপানীরা সাধারণত ভাবানুবাদ করে। আমাদের পক্ষে সেটা আরো সহজ। সামনের পঞ্চাশ বছর যদি জোর কদমে অনুবাদকার্য চলে তা হলে ইংরেজী না শিখেও শিক্ষিত মহলে সমানভাবে মেলামেশা চলবে। তার আগে নয়। তখনো ইংরেজী জানার প্রয়োজন থাকবে, কারণ কোনো অনুবাদই মূলের মতো হতে পারে না। বিশেষত ভাবানুবাদ অনেক সময় ভুল ধারণার জন্ম দেয়। আমার কবিতার জাপানী অনুবাদ ছাপা হবার পর একজনকে বললুম ওটা আবার ইংরেজী করে আমাকে শোনাতে। যা শুনলুম তা আমার লেখাই নয়।

অতএব পঞ্চাশ বছরের তুমুল অনুবাদচর্চার পরেও ইংরেজীর প্রয়োজন থাকবে, যদি মূল রচনার কোনো মূল্য থাকে। থাকবেই মূল্য, কারণ রচনা হচ্ছে রিয়ালিটির প্রত্যক্ষ দর্শন। রিয়ালিটির যদি মূল্য থাকে তবে মূল রচনারও মূল্য আছে। ইংরেজকেও এই কারণে রবীন্দ্রনাথের মূল রচনা পড়তে হবে বাংলায়। বৈষ্ণব কবিতা পড়তে হবে বাংলায়। অনুবাদে মূলের স্বাদ মিলবে না। বাংলা যদি আরো উন্নত হয় মূলের গুণেই হবে, মৌলিক রচনার গুণেই। আমরা যারা বাংলায় লিখি এ সত্য সব সময় মনে রাখব। রিয়ালিটিকে বাংলায় সরাসরি রূপান্তরিত করতে হবে, ইংরেজীর মাধ্যমে নয়। এ হলো লেখক মহলের কর্তব্য। আর

শিক্ষিত মহলের কর্তব্য রিয়ালিটিকে বাংলার মাধ্যমে না পেলে ইংরেজীর মাধ্যমে পাওয়া। মিথ্যা জাতীয়তার দোহাই দিয়ে আনরিয়াল জগতে বাস করা বিড়ম্বনা। রিয়াল জগতে বাস করলে জাপানীরা কখনো যুদ্ধে নেমে মার খেয়ে ঘায়েল হতো না। এখন তাদের মধ্যে ইংরেজী শেখার জোয়ার এসেছে। দুটি বিদেশী ভাষা প্রত্যেককে অবশ্য শিখতে হয়। তার একটি ইংরেজী, অন্যটি ফরাসী কিংবা জার্মান। রিয়াল জগতে বাস করব, না আনরিয়াল জগতে বাস করব, এ হলো জীবনমরণের প্রশ্ন। এখনো এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি বলেই ইংরেজীর বিরুদ্ধে এত কথা শোনা যায়।

এতক্ষণ যা লিখলুম তা শিক্ষা ও সংস্কৃতির এলাকায় পড়ে। সরকার বা শাসনের এলাকায় নয়। সে এলাকায় ইংরেজী রাখার কিছুমাত্র দরকার থাকত না, যদি বাংলাদেশ আলাদা একটা রাষ্ট্র হতো। অথবা ভারত সরকারের ভাষা যদি বাংলা হতো তা হলেও ইংরেজীর দরকার হতো না। তার ভাষা বাংলা নয় বলেই আমাদের এত মাথাব্যথা। আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি কেন্দ্র থেকে ইংরেজী উঠে গেলে ও তার শূন্য স্থানের খানিকটা বাংলাকে না দিলে কেন্দ্রীয় শাসনের উপর আমাদের বিশেষ কোনো হাত থাকবে না, আমাদের কণ্ঠস্বর সেখানে পৌঁছবে না। পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় এমনিতেই আমরা হটতে লেগেছি, এর পরে তলার দিকে থাকব। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট থেকে বাঙালীর নাম মুছে গেছে, কংগ্রেস হাই কমাণ্ডেও বাঙালী নেই। সার্ভিসগুলোর থেকে ক্রমেই আমরা সরে যাব। এই কি সেই ত্যাগের সাম্য যার উপর জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা? না জাতীয় ঐক্য বলতে এই বোঝায় যে এক ভাই হবে দৈত্য, আর সকলে হবে বামন?

নর্মান আমলের পর আট শ' বছর কেটে গেছে। এখনো ইংলণ্ডের রাজপরিবারে, অভিজাত সমাজে, হোটেলে রেস্টোরাণ্টে ফরাসী ভাষার আদর। তা হলে আমাদের এদেশেই বা কেন পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় ইংরেজী ভাষার কদর থাকবে না আরো অনেক কাল?

জাতীয় আত্মসম্মান যদি আহত হতো ইংরেজরা তাদের দেশের হোটেলের মেনু ফরাসীতে ছাপতে দিত না, হোটেল বয়কট করত। জীবনে এমন দুটো একটা ক্ষেত্র থাকবেই যেখানে জাতীয় আত্মসম্মানই একমাত্র গণনা নয়। সে ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের লোক ফরাসী পছন্দ করবে, ভারতের লোক ইংরেজী পছন্দ করবে। এই তো সেদিন ইন্দোনেশিয়ার লোক রোমক লিপিকে করল নিজেদের ভাষার লিপি। চীনারাও শুনছি তাই করবে, বিকল্পে। জাতীয়তা কি তবে উৎকট বর্জননীতি চালাবে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কেবল আমাদেরই দেশে?

সরকারের কাজকর্মের ভাষা যাই হোক না কেন কর্মচারী নির্বাচনের জন্যে যেসব প্রতিযোগিতা হয় সেগুলি ইংরেজীতে হলে যেমন সুবিচার হতে পারে হিন্দীতে বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় হলে তেমন সুবিচার সম্ভব নয়। কারণ যাদের মাতৃভাষা হয় প্রতিযোগিতার বাহন তারা জন্মসম্বন্ধে একটা অলক্ষ্য সুবিধা পায়, সেটা তাদের অন্যভাষী প্রতিযোগীরা পায় না, সুতরাং নিছক গুণের বিচারে যার যা পাওনা তার থেকে সে বঞ্চিত হয়। ইংরেজীতে ইংরেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে ভারতীয়রাও কোনো কোনো বছর সফল হয়েছে তা ঠিক, কিন্তু শেষপর্যন্ত ইংরেজকে ভারত ছাড়িয়ে তবেই ভারতীয়রা নিষ্কণ্টক হলো। তেমনি হিন্দী বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রতিযোগিতা হলে সব প্রতিযোগী যদি স্বভাষী না হয় তবে নিষ্কণ্টক হবার জন্যে একদিন না একদিন পরভাষীকে তাড়াবার জন্যে লোকে দেশ ভাগ করার কথাই ভাববে। প্রতিযোগিতা যেখানে স্বভাষীর সঙ্গে স্বভাষীর সেখানে না হয় ইংরেজীকে বাদ দাও। কিন্তু যেখানে হিন্দীভাষীর সঙ্গে অহিন্দীভাষীর সেখানে ইংরেজীর বদলে হিন্দীকে

প্রতিযোগিতার বাহন করলে দেশবিভাগ একদিন অনিবার্য হবে। রফা হিসাবে একদলের জন্যে হিন্দীতে ও আরেকদলের জন্যে ইংরেজীতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলে তো দেশবিভাগের বিষবৃক্ষ জেনেশুনে রোপণ করা হবে। প্রত্যেকটি সার্ভিস ধীরে ধীরে দু'ভাগ হয়ে যাবে। একদিন একদল যাবে হিন্দীস্থানে, আরেকদল যাবে অহিন্দীস্থানে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিযোগিতাগুলিতে নেপালী প্রতিযোগী থাকাতে বাংলাকে বাহন করাও অদূরদর্শিতা হবে। তেমনি আসামের প্রতিযোগিতাগুলিতে বাঙালী প্রতিযোগী থাকতে আসামীকে বাহন করাও হবে অদূরদর্শিতা। সব রাজ্যেই কিছু কিছু অনাভাষী থাকবেই। সেইজন্যে একটিমাত্র ভাষায় প্রতিযোগিতা করতে হলে ইংরেজীই সে ভাষা। একাধিক ভাষায় করতে গেলে রাজ্যভাগের কল্পনা মনে জাগতে পারে।

ইংরেজী থেকেই আমাদের ঐক্য এসেছে, যদিও ইংরেজ থেকে এসেছে পরাধীনতা। এই জটিল সত্যটিকে সরল করে আনলে ইতিহাস তার প্রতিশোধ নেবে। ইংরেজকে বিদায় দিয়ে স্বাধীন হয়েছি, তার থেকে এটা আসে না যে ইংরেজীকে বিদায় দিলেও আমরা একত্র থাকব। পৃথিবীর সব দেশেই দেখা গেছে এক একটি ভাষাকে অবলম্বন করে এক একটি নেশন গড়ে ওঠে। সুইজারল্যাণ্ডের মতো দুটি একটি ব্যতিক্রমকে বলা যেতে পারে নিয়মের নিপাতন। নিপাতনই নিয়মের প্রমাণ। ভাষাগুলি সুইসদের নিজস্ব নয় বলেই ওরা তা দিয়ে দেশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ওটা যেন তিন ভাষার তেমাথা। ভারতবর্ষের ছবিখানা সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এখানে যার যার ভাষা তার তার নিজস্ব। অর্থাৎ এ যেন ফরাসী জার্মান ইটালিয়ানের একান্নবর্তী পরিবার। এ পরিবার ভেঙে যেতে পারে, ভাই ভাই পৃথক হতে পারে, সহযোগিতার বদলে প্রতিযোগিতার ভাব বাড়লেই। এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পক্ষপাতের ভাব জাগলেই।

স্বৈরতন্ত্রী সরকারের চেয়ে গণতন্ত্রী সরকারের কর্মচারীসংখ্যা বেশী। গণতন্ত্রী সরকারের চেয়ে সমাজতন্ত্রী সরকারের কর্মচারীসংখ্যা বহুগুণ। সুতরাং কর্মচারী নির্বাচনের প্রতিযোগিতা দিন দিন আরো গুরুত্বপূর্ণ হবে। হিন্দীকে একমাত্র মাধ্যম করলে অবিচার এড়ানো যাবে না। হিন্দী ইংরেজী উভয়কে মাধ্যম করলে প্রত্যেকটি সার্ভিস দু'ভাগ হয়ে যাবে মনে মনে। ধীরে ধীরে সৈন্যদলের মধ্যেও ভেদবুদ্ধি ঢুকবে। তা হলে দেশরক্ষা করবে কে?

সরকারী ভাষা কমিশন গোড়ায় ভুল করেছেন। ইংরেজ যেমন এদেশকে পরাধীন করেছিল তেমনি ইংরেজী থেকে এসেছিল ঐক্য। পরাধীনতার অন্তরায়কে সরিয়ে স্বাধীন হওয়া ভালো। কিন্তু ঐক্যের অবলম্বনকে হাঁটিয়ে ছত্রভঙ্গ হওয়া ভালো নয়। ছত্রভঙ্গতার প্রশ্রয় না দিয়ে হিন্দী প্রবর্তন যেসব ক্ষেত্রে সম্ভব সেসব ক্ষেত্রে হোক। কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সেখানে ইংরেজীকেই একমাত্র মাধ্যম রাখতে হবে আরো অনেক কাল। কেন্দ্রীয় সরকারে তো নিশ্চয়ই, রাজ্য সরকারেও যথাসাধ্য। নয়তো একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি হবে, যেমন ইংরেজ শাসনের আগে ছিল। ঐক্যের বনেদ পাকা না করে এসব খামখেয়ালি নিতান্ত কাঁচা কাজ। বাবুরা ধরে নিয়েছেন যে ভারতের ঐক্য ভারতীয়দেরই হাতে গড়া এবং অটুট। তা নয়। আর হিন্দী সেটাকে মজবুৎ করা দূরে থাক আর একটু ঝাঁকিয়ে দেবে। যদি তাঁদের সুপারিশ মেনে নেওয়া হয়। নয়তো হিন্দীর প্রতি আমার কোনো বিরূপভাব নেই।

যেমন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তেমনি উচ্চতর পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সুবিচার চাই, ঐক্য চাই, সুতরাং ইংরেজী চাই। তা ভিন্ন শিক্ষার মান উন্নত রাখার উপায়ও নেই।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

স্টেফান ও মিরকো

ক্লাবের বাইরে স্বল্পভাষী স্টেফানের সংগে একবার কথা আরম্ভ হ'লে যেন সদাপ্রবাহিত উৎসধারার মতো তার কাহিনীগুলি বেরিয়ে আসত। সে বলত, 'কর্মজীবনে নিষ্ঠাই সবচেয়ে বড় জিনিস। যা কিছু সফল ক'রে তুলতে চাও তার পিছনে নিষ্ঠাকে না ঢাললে, সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই। নিষ্ঠাকে জীবনে আনতে হ'লে চাই সংকল্প, আর এই সংকল্পের যাচাই হয় শ্রম, ও দুঃখ কষ্টের সহনশীলতায়।' এ বিষয়ে সে একদিন বলল, 'জান, আমি এ নিষ্ঠাকে দেখেছি আমার পিতার কর্মে'। প্রত্যেকটি জুতোকে তিনি যেরকম প্রাণ ঢেলে গড়তেন তাতে মনে হ'ত যেন, সেগুলি তৈরী হ'লে জীবন্ত হ'য়ে তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে আপনা থেকে চ'লতে সুরু করবে। তুমি হাসছ কিন্তু আমি মনে করি তোমার একটা ভাস্কর্য গড়ায় যতখানি নিষ্ঠা দিয়ে থাক, আমার পিতা জুতো তৈরীতে প্রায় ততখানিই নিষ্ঠা ঢেলে দিতেন। তিনি বলতেন, মানুষের মতো জুতোরও জীবনী লেখা যায়। মানুষের পদাশ্রয় হ'লেই জুতো হয় জীবিত এবং মানুষেরই মতো চলে তার সুখদুঃখের জীবন। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলে আমাদের শরীরের যে অবস্থা, শেষবারের মতো মানুষের পদ-বিচ্ছিন্ন হ'লে, জুতোরও সেই অবস্থা। এই জুতোগুলি কেউ বা আসে সৌভাগ্য নিয়ে, কেউ আসে মন্দ ভাগ্য নিয়ে। শ্রমিক, চাষী ও ফিরিওয়ালা জুতা কিনবে বেশ মজবুত দেখে এবং তারপর থেকেই সুরু হ'য়ে যাবে সে জুতোর দুর্ভোগ্য। জলে কাদায় বালিতে পাথরে সেই যে তার মস্‌মস্‌ ক'রে ঘর্ষণ ও মর্দন আরম্ভ হ'ল, তার আর বিশ্রাম হবে না—যতদিন না তাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হ'চ্ছে। কিন্তু তার আগে, তার ধূলায় ধূসরিত দেহে উঠবে অনেক তালির অপমান। ধনীর পায়ের জুতো, দোকান ছাড়লেই সুরু করে আনন্দের জীবন। প্রচুর বিরামের মাঝে মাঝে মথমলগালিচার সংগে মাখামাখি ক'রে গর্বে হয় ভরপুর। সৌখীন মহিলার পায়ের জুতোর যত সোহাগ আর সম্মান, তত স্বল্পস্থায়ী তার এই সৌভাগ্যের জীবন কারণ একটু জৌলুষ কমলেই, তাকে আশ্রয় নিতে হবে পরিচারিকার চরণে। তখন না থাকবে তার আগের যত্ন ও আদর, না থাকবে সে অলসচরণের সুখস্পর্শ। তার বুক দলতে থাকবে কড়া-পড়া ভারী পায়ের কর্তার আজ্ঞাবহনকারী অবিরাম পদক্ষেপ।' আমি অবাক হ'য়ে শুনছি স্টেফানের কথা। সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লেও তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে তার বংশগত পেশা, আর এসব কথা বিনা দ্বিধায় সে বোধহয় স্বদেশী বন্ধুদের বলবার সুযোগ পায়নি। সে বলে চলেছে 'সহরতলীতে আমাদের বাড়ী। আমরা গরীব হ'লেও, আমাদের সংসারে অভিযোগ আর ঈর্ষার কথা শুনতে পাবে না। আমার পিতা একবার ব'লেছিলেন যে, এক ধনীর কর্মচারী জুতো কিনতে এসে তার মনিবের দুর্ভাবনা ও দুর্ভোগের যা লম্বা ফর্দ দিল তাতে মনে হয়, আমরা গরীব হ'লেও, তার চেয়ে অনেক সুখে আছি। আনন্দ ও সুখ জীবনে কদাচিৎই অর্থের অনুমানে মাপা যায়। আমরা সন্ধ্যেবেলায় যে যার কাজ সেরে যখন নৈশাহারে বসতাম, আমার পিতা বাড়ীর তৈরী গরম মোটা রুটির টুকরো ছুরি দিয়ে কেটে সকলের হাতে দিতেন। তারপর সুপ্‌ প্লেটে পড়লেই, তিনি চোখ বুজিয়ে স্বল্প কথায়

ঈশ্বরকে আমাদের এই আহার্য অর্জনের উপায় দেবার প্রার্থনা ও প্রণতি জানাতেন। তারপরে আমরা সব হুস্‌হুস্‌ ক'রে খেতে সুরু করতাম। খাওয়ার শেষে শীতের দিনে আগুনের ধারে ব'সে কে কত মজার গল্প ঘটনা ব'লে, বাহাদুরী পেতে পারে আমাদের মধ্যে তার যেন প্রতিযোগিতা সুরু হ'য়ে যেত। আমার একটি ছোট ভগ্নী ছিল, যে যখন কয়েকদিনের অসুখে মারা গেল, তার শোকে আমাদের বুক ফেটে মনে হ'ত যেন আমরাও শীঘ্রই তার সংগী হব। আমার পিতার নয়নের মণি ছিল সে কিন্তু আশ্চর্য তিনি কোন অনুযোগ না ক'রে আমার মাকে নিয়ে যেতেন গির্জায়। তার স্মরণে দুটি মোমবাতি জ্বালিয়ে, প্রার্থনা ক'রে যখন ঘরে ফিরতেন তাঁদের মুখে দেখে বুঝতাম যে, এই তাঁর শোক ও বেদনার কিছুটা লাঘব হয়েছে। আমি নতুন জগতের দীক্ষায় মানুষ, আমার মনে নেই ভগবানে বিশ্বাস। গির্জায় প্রার্থনা আমার কাছে বুজরুকি। কিন্তু এই বুজরুকিতেই তো আমার বয়োবৃদ্ধরা শোকে পাচ্ছেন শান্তি। আমাকে শোক লাঘবের পন্থা খুঁজতে হবে আমার সহ্যশক্তিতে আমার ব্যক্তিত্বে। যদিও জানি প্রার্থনা দিয়ে নিজেকে আমরা ছলনা ক'রে থাকি তবুও সেই ছলনা, অন্ততঃ হৃদয়ের বেদনাকে খানিকটা লঘু ক'রে দিতে পারে। কাজেই ছলনায় শোকের লাঘব আর তার ত্যাগে শোকের তীব্র বেদনাকে জয় করবার অক্ষম প্রচেষ্টার মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণীয় বলা শক্ত।

আমাদের পাড়ায় শ্রমিকদের নিরভিমানী গৃহগুলিতে আধুনিক সভ্যতার সুখসুবিধার কোন উপাদান নেই। দারিদ্রময় এই গৃহগুলির, গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের মত, একটা বিশেষ পরিচয় আছে যাকে—রাতের অন্ধকারে আকাশের গায়ে-পড়া কালো স্যিলুয়েট-এ চেনা যায়। আগামী দিনে আমরা যখন গড়ব নতুন রাষ্ট্র তখন এই ডেকাডেণ্ট সভ্যতার নিদর্শনগুলি মুছে যাবে। নতুন ইমারত উঠবে শ্রমিক চাষীদের জন্যে, বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আধুনিক আবিষ্কারের সুখসুবিধার আওতায় ভরা। সেখানে ব্যক্তিগত রুচির জন্য বিশেষ ঢংএ গড়া বাড়ী থাকবে কিনা সন্দেহ। এক ধাঁচে সারি সারি বাড়ীর মধ্যে বিশেষ পরিচয় কেবল থাকবে একটা নম্বরে। ঠিক এমনিভাবেই হয়ত, আজ যাদের গ্রামের জোঠা খুড়ো ব'লে জানি, যাদের ছেঁড়া কোট আর ঝোলা পাংলুনের নক্‌সা দেখে দূর থেকে চিন্‌তে পারি, তারাও সব হারিয়ে যাবে টেক্‌-সই শ্রমিক-চাষীদের স্মার্ট ইউনিফরম্‌এ। তাকে বললাম, 'স্টেফান, তুমি প্রলেতারিয়েত পরিবার থেকে এলেও, তোমার মনোভাব অত্যন্ত রিএাক্‌শনারি মনে হচ্ছে।' সে বল্‌লে, 'সে আমি জানি। একটা ডেকাডেণ্ট ও ক্যাপিতালিস্ত্‌ সমাজের অংশ আমি, শ্রমিক হলেও। তাই আমার পক্ষে রিএাক্‌শনারি ধারণা কিছু অসংগত নয়। আমি চাই নতুন রাষ্ট্র, তার জন্যে আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি, ডেকাডেন্সের এই চিহ্নগুলিকে আমি ভুলতে পারব না। আমার পরে যারা আসবে নতুন সমাজে ও রাষ্ট্রে জন্ম নিয়ে, এ সম্বন্ধে অজ্ঞাত তারা, এগুলির অভাব কোনদিন বোধ করবে না। তোমাকে আমার অনুরোধ যে, তুমি এইলাস বা অন্য কাউকে এই কাহিনীগুলির কিছু ব'ল না, যারা ক্যাপিতালিস্ত বা বুর্জোয়া থেকে হয়েছে কমিউনিষ্ট, তাদের রিএাকশনারি হওয়া স্বাভাবিক ব'লে পদস্খলনে পায় ক্ষমা কিন্তু প্রলেতারিয়েত কমিউনিস্টের যদি হয় অধঃপতন, তাহলে তার নেই ক্ষমা এবং সে পাবে চরম দণ্ড।' জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোন সাহসে আমায় বিশ্বাস ক'রে বললো একথাগুলি। সে বলল, 'সব বলবার কথা বুকে জ'মে যখন আমাদের প্রায় শ্বাসরোধের মত অবস্থা হয়, তখন বিশ্বাস ক'রে কাউকে ব'লে ফেলি। এ সাধারণ ভুল সকলেরই হয়ে থাকে। নিজের মনের কথা যদি অযোগ্যকে বিশ্বাস ক'রে ব'লে ফেলি, তখনই আমরা পড়ে যাই লিকুইডেশানের তালিকায়।

'প্রত্যেকটি জিনিসের জন্মের সংগে জড়িত আছে ক্লেশ ও সংগ্রাম। স্যোসালিজম-এর পরি-

পূর্ণভাবে জন্ম হ'তে প্রয়োজন হবে বহু কাণ্ডের ও সংগ্রামের প্রচুর অদল বদল ও ভালমন্দ যাচাইএর। তবেই প্রতিষ্ঠা হবে আগামী দিনের আদর্শ রাষ্ট্রের। এইলাসের মতন লোকেরাই মনে করে, গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে নরম মনের লোকদের নিজমতবাদে বিশ্বাস করিয়ে, নিজের মতন ক'রে তাদের চালিয়ে, ছলে বলে কৌশলে এনে দেবে আদর্শ স্যোসালিষ্ট ষ্টেট যেন গাছ থেকে পেড়ে দেওয়া একটি পরিপক্ক আপেলের মত, লোকের হাতে তুলে দেবে তার এই অপূর্ব সৃষ্টি। এই সব গরম কথায় ও আস্ফালনে যে সব লোকের মনে টোল পর্যন্ত পড়ে না, তারাই কেবল জানে কত সময়, কত সংগ্রাম ও কত আহুতি লাগবে এই স্যোসালিজমের প্রতিষ্ঠায়। এই অভিযানের যোগ্য নায়ক হচ্ছে মির্‌কোর মতো লোকেরা। তুমি বোধহয় জান না, মির্‌কো ছিল আমাদের লিডার। তার অধিনায়কত্বে পার্টিতে আমরা নির্ভয়ে জানাতে পারতাম স্ব স্ব মতামত, তাকে প্রতিবাদ করবার সুযোগ সে দিত এবং আলোচনার পর আমরা সকলে একটা সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম। তারপর এল এইলাস, আইন পড়ার বৃত্তি নিয়ে এখানে। দেশে ছিল সে মির্‌কোর প্রাণের বন্ধু। ইয়ানিনা মির্‌কো আর এইলাসের মাঝে পড়াশ সে বন্ধুত্বে চিড়্‌ খেল। ইয়ানিনার প্রথম পরিচয় হয় এইলাস-এর সংগে এবং একদিন সে ক্লাবের সকলের সংগে ইয়ানিনার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে এসে বল্‌লে, 'বন্ধুরা, ইয়ানিনা আমার সঙ্গিনী কিন্তু তোমাদের আমার জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, সে এক দেশদ্রোহী পলাতক হোয়াইট রাশিয়ান কাউন্টের মেয়ে। আমার পার্টি যদি তার সংগে বন্ধুত্ব অনুমোদন না করে তাহলে, আমাদের সম্পর্ককে এখুনি শেষ করে দেব। অবমানিতা ও রুষ্টা ইয়ানিনা চ'লে যাচ্ছিল কিন্তু মির্‌কো ছুটে তার পথ রোধ ক'রে বলেছিল 'মাদ্‌ময়জেল, তুমি একজনের অভদ্রতার কালি, আমাদের সকলের মুখে লাগিয়ে দিয়ে চ'লে যাবে, এ আমি সহ্য করব না। বন্ধু এইলাস-এর জানা উচিত যে, জন্মগত কেউ কুলাক্‌, প্রলেতারিয়েত বা বুর্জোয়া হয়না। তাদের বিশিষ্ট পরিচয় হয় মনোবৃত্তি, আচারে ও ব্যবহারে। আমাদের পার্টি, কারোর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের উপর খোদ্‌কারী করে না। ব্যক্তিগতভাবে পার্টির সদস্যের উপযুক্ত বন্ধু নির্বাচন, তার একারই দায়িত্ব। আমরা স্যোসালিজমের বিরুদ্ধবাদী দলকে তফাতে রাখবার চেষ্টা করব। কিন্তু সে দলভুক্ত কেউ যদি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তাকে আমরা সামাজিক শিষ্টাচার দেখাতে কুণ্ঠিত হব না। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে রাজনৈতিক কারণে এই রকম রূঢ় ব্যবহার দেখান অত্যন্ত অশোভন। মাদ্‌ময়জেল্‌ আমি সকলের তরফ থেকে এইলাস-এর এই দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সেই থেকে ইয়ানিনা মির্‌কোর অনুরক্তা হ'য়ে পড়ল এবং এইলাস সুযোগ পেলেই মির্‌কোকে, নরমপন্থী, দোমনা, বুর্জোয়া ঘেঁষা ইত্যাদি ব'লে মিটিং-এ আক্রমণ সুরু করল। শেষে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ তৈরী ক'রে দেশের মূল পার্টির কেন্দ্র থেকে এখানকার লিডারশিপ্‌ থেকে মির্‌কোর অপসারণের ব্যবস্থা করল এবং এইলাস নিজে হ'ল লিডার মির্‌কো এখনো নির্ভয়ে ব'লে চলে তার মতামত। এইলাস অবশ্য সেটা মোটেই পছন্দ করে না। আমাকে একদিন ব'লেছিল যে, মির্‌কোর উপস্থিতিতে আমাদের পার্টির সলিডারিটি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। সে নিজে সরে না গেলে, উপায়ন্তরে তাকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। মির্‌কোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার বেশ ভয় হয়। তাকে একবার বলায় সে হেসে উড়িয়ে দিল আমার সাবধানবাণী। বল্‌ল, 'তা কি ক'রে সম্ভব? এইলাস আমার আবাল্য বন্ধু।'

আমি একদিন ইয়ানিনার কথা তুলে এইলাসকে বললাম 'আচ্ছা, তুমিও তো এসেছ পেতিবুর্জোয়া শ্রেণী থেকে কাজেই তোমার সততা ও স্যোসালিজমে বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অনেরাও তো সন্দেহ ক'রতে পারে এবং যদি প্রশ্ন করে তো কি জবাব দেবে?' সে একটা উপেক্ষার

হাসি হেসে বলল 'আরে এ অতিশয় সোজা। তুমি বই পড়লে দেখবে যে সাম্যবাদী বিপ্লবের নেতারা সব আসে এবং তৈরী হয়, পেতিবুর্জোয়া শ্রেণী থেকে। তারাই চাষী ও শ্রমিকদের দলকে সজাগ ক'রে দেয় তাদের ন্যায্য দাবী কতটা এবং কোথায় সে সম্পর্কে। আমি আমার কাজেই প্রমাণ করে দেব স্যোসালিজমের প্রতি আমার অবিচলিত একনিষ্ঠতা, এ ধরণের প্রশ্ন ও সন্দেহ আসবে কেবল মির্‌কোর মতো পথভ্রষ্ট স্যোসালিষ্টদের সম্বন্ধে।' তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে মির্‌কোর বন্ধু হয়ে কেন মিথ্যা অভিযোগে তাকে পার্টির লিডারশিপ থেকে সরাল। সে বলল 'এ তো মিথ্যা অভিযোগ নয়, পার্টির শুভার্থে সত্য উপায়। পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে যে কোন উপায়ই নৈতিক ও সত্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি এখনো মির্‌কোর পরম বন্ধু এবং আমি জানি যে, সে অতিশয় সৎ ও সজ্জন ব্যক্তি। কিন্তু পার্টির প্রয়োজনের পক্ষে মিরকো একেবারেই অপদার্থ।' একবার ইচ্ছা হ'ল তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, পার্টি কি উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে এবং তাতে কি ব্যক্তিগত সততা, বন্ধুত্ব, প্রেম বা ভালবাসার কোন স্থান বা মূল্য নেই? কিন্তু এইলাসের জবাব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ না থাকায় চুপ ক'রে গেলাম।

মির্‌কোকে প্রকারান্তরে জানাবার চেষ্টা করেছিলাম এইলাসের তার প্রতি বিদ্বেষ কত তীব্র কিন্তু মির্‌কো সে কথায় কান দিল না। সে একদিন বল্‌ল 'দেখ, কমিউনিজম্ আইডিয়া হিসাবে এক জিনিস আর তাকে কার্যকরী করতে যে উপায়ের সৃষ্টি হয় সে আর এক জিনিস। ব্যক্তিগত ভাবে আমি যদি চেয়ে থাকি আমার চিন্তার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মনের মতো সহধর্মিনী যাকে নিয়ে বাঁধব আবশ্যকের অনতিরিক্ত ঘর এবং আমাদের সন্তান সন্ততিদের গ'ড়ে তুলবো সমাজের ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত অধিবাসী ক'রে; একেই সফল ক'রে তুলবার জন্য চাইব কমিউনিজম—আমার একার সুযোগ ও সুবিধার জন্য নয়, আমার এই অভিলাষকে পরিপূর্ণ দেখতে চাইব আমার চারিপাশের আর সকলের মধ্যে তা হলে আমার এই অভিলাষ কি অন্যায় দাবী? এই বিশ্বাসকে বাস্তবে পরিপূর্ণ করতে সংগ্রামের প্রয়োজন হবে কিন্তু তার বোধন সুরু না হতেই 'যুদ্ধং দেহি'-র ভাব দেখিয়ে কি লাভ? মানব সমাজের মঙ্গলার্থে যারা নিজেদের ক'রেছে ব্রতী, তাদের প্রত্যেকের সংকল্পকে পরিষ্কার ক'রে নিতে হবে। এমন কি অবচেতনায় নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কোথাও, কোনমতে তাদের লক্ষ্যপথের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে কি না।' তারপর একটা আপশোষের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল 'কি জানি, এইলাস বোধহয় ঠিকই বলে যে, আমার মধ্যে খানিকটা আছে বুর্জোয়াজি। আমার ডাচ পেণ্টিং ভাল লাগে, অত্যন্ত ভোগ বিলাসের ছবি সে সব। গোয়েথে আর ইউগো পড়ে আমার আনন্দ হয়—কিন্তু পার্টি সমর্থিত লেখক তাঁরা নন। আর মোৎসার্তের সঙ্গীত শুনতে আমি পাগল কিন্তু তার সৃষ্ট সুর ধারা কেবল রাজদরবারে অভিজাত শ্রেণীর রুচি সেবার্থে রচিত বলে, আমি পার্টি থেকে পাই গালাগালি। আমার চ'লে যেতে ইচ্ছে করে এমন কোন স্থানে যেখানে নেই শ্রেণী, নেই জাত, যেমন পশুরা দল বেঁধে থাকে এক সঙ্গে, প্রকৃতি তাদের এক ছাঁচে ঢেলেছে ব'লে। আমি থাকতে চাই সেই রকম মানুষের সমাজে।'

ষ্টেফান যা ভয় ক'রেছিল, শেষে তাই ঘটল। এইলাস মিরকোর নামে জাল প্রমাণ কাগজপত্র ও মিথ্যা অভিযোগ পেঁছে দিল আপন দেশের সরকারের কাছে। মির্‌কোর কাছে এল সরকারী নির্দেশ যে, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যে সে লিপ্ত থাকায়, তার বৃত্তি বন্ধ করা হ'য়েছে এবং ফরাসী সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে মির্‌কোকে তিনদিনের মধ্যে তার স্বদেশের সীমানায় পেঁছে দেওয়া হয়। তার এই ভাগ্য বিপর্যয়ে আমরা সকলেই বিশেষভাবে দুঃখিত

হলাম। সে আমাদের সকলকে ডেকে বলল, 'আমার যা জিনিসপত্র আছে সেগুলি তোমরা যে দামে খুশী নিয়ে নাও আর যদি কেনবার সংগতি না থাকে তাহলে উপহার হিসাবে নিয়ে যাও, যা তোমাদের প্রয়োজন। সকলেই আপন সামর্থ মত অর্থ দিয়ে কিনে নিল টাইপ রাইটার, ক্যামেরা, রং, তুলি, ইজেল, ক্যানভাস, কাগজ ও ফ্রেম। সে এমনকি তার বাড়তি জামা কাপড়ও বেচে দিল নাম মাত্র মূল্যে। তারপর চ'লে যাবার দিন, আমাদের নিমন্ত্রণ করল তার সঙ্গে রেস্তোরাঁতে ডিনার খাবার জন্যে।

সে এভাবে কষ্টলব্ধ অর্থ অপব্যয় কর্‌ছে বলে আমরা যে যার আহারের দাম দিতে চেষ্টা করলে মির্‌কো ভীষণ আপত্তি করে বল্ল "তোমরা যদি সত্যি আমাকে ভালবেসে থাক তাহলে আমাকে এ ভোজ দেওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করো না। কয়েকটা ফ্রাঙ্ক বাঁচানোর চেয়ে তোমাদের খাইয়ে যে তৃপ্তি পেলাম সেইটে হবে আমার যাত্রার সবচেয়ে বড় পাথেয়।" রেস্তরাঁ থেকে সে আমাদের নিয়ে গেল ছাত্রপল্লীর একটি সিনেমায় এবং আমাদের সকলের প্রবেশমূল্য নিজেই দিল। এই আসন্ন বিদায় ভোজ-এ ইয়ানিনার অনুপস্থিতি সকলের কাছে বেখাপ্পা ঠেকলেও কারণ জিজ্ঞাসা করতে আমাদের দ্বিধা হচ্ছিল। শেষে একজন মির্‌কোকে প্রশ্ন করলে সে বল্ল "যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন না হচ্ছি আমি আমার চারিপাশে হাসিমুখ দেখতে চাই, ইয়ানিনা এখানে উপস্থিত থাকলে তা সম্ভব হোত না। আমি অপেরার দুখানা টিকিট কিনে এইলাস্‌কে অনেক অনুরোধ করে পাঠিয়েছি তাদের দুজনকে গীতাভিনয় দেখতে। সে এখনো ঠিক জানে না যে আমি যাচ্ছি এবং আশা করি এইলাস্ তাকে আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে বলে দেবে না আমার এই গোপন প্রস্থানের কথা।" পরের দিন ভোরেই তাকে রওনা হ'তে হবে। সিনেমা থেকে প্রায় রাত একটায় বেরিয়ে আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। দৃঢ় আলিঙ্গন ও শেষ করমর্দনের সময় সকলের চোখ ছলছল হয়ে উঠেছিল। দূরে অপসৃয়মান মির্‌কোকে আকাশে হাত দুলিয়ে আবার যখন কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল "অর্‌ভোয়ার্" বলে, কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম আনন্দোচ্ছ্বাস আনবার চেষ্টায় সে আওয়াজ রুদ্ধ আর্তনাদের মতন শোনাল।

সকাল তখন সাতটাও বাজেনি। ঘুমের ঘোরে শুনছি কোন সুদূর থেকে কে আমায় ডাকছে। হঠাৎ জেগে উঠে শুনলাম ষ্টেফানের গলার আর দরজায় টোকা দেওয়ার চাপা আওয়াজ। ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলতেই সে বল্ল "কাপড় পরে শিগ্গির চল আমার সঙ্গে যদি মির্‌কোকে শেষ দেখতে চাও।" বল্লাম "কাল তো তার কাছ থেকে আমরা সবাই বিদায় নিলাম। সে কি এখনও যায়নি!" ষ্টেফান অশ্রুভরা চোখে ধরাগলায় জানাল "সে আমাদের ঠকিয়েছে। জান তো তার আর আমার কামরা পাশাপাশি। ভোর তিনটের সময়ে তার ঘর থেকে একটা ভীষণ বিষ্ফোরণের আওয়াজে আমি জেগে উঠতে তার দরজায় অনেক ধাক্‌কা দিয়ে সাড়া না পেয়ে কাঁসিয়ার্জকে ডেকে আনি। সে আর আমি তার নাম ডেকে কোন শব্দ না পেয়ে পুলিস ডাকি এবং তারা এসে দরজা খুলতে দেখি মির্‌কো নিজের মাথায় পিস্তলের গুলি মেরে আত্মহত্যা করেছে।"

চল্লাম তার সঙ্গে গরীব বস্তির এক নগণ্য হোটেলে। পথে ষ্টেফানএর কাছে শুনলাম যে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা হোটেলে পেঁছালে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে তাকে বলে "ষ্টেফান, দেশের সরকারের কাছে আমি আজ দেশদ্রোহী আর পার্টির কাছে আমি অবিশ্বাসভাজন ও ভ্রষ্টকর্মী। আমার চলার পথের সামনে উঠে গেছে পাঁচিল আর পাশে ও পশ্চাতে পড়ে গেছে কাঁটা-বেড়া এবং আমার দাঁড়িয়ে থাকবার ঠাঁইটুকুও নেই। একেই বলে

পারফেক্‌ট্‌ লিকুইডেসন্‌। তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে আমার করমর্দন করে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।"

আমরা হোটেলে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। আত্মঘাতীর মৃতদেহ দেখবার জন্য জীবিতদের কি আকুল আগ্রহ। দরজায় পুলিস আমাদের ঢুকতে দেখে খুব রূঢ় ভাষায় সরে যেতে বল্ল। তারপর স্টেফানকে চিন্‌তে পেরে বল্ল "তুমি ভিতরে এস কিন্তু ও আসতে পারবে না।" সে পুলিসকে জানাল যে মির্‌কোকে শেষ যারা জীবিত দেখেছে আমি তাদের একজন। তদন্তের সময় সাক্ষী দিতে আমার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে নাম ঠিকানা লিখে ভিতরে যেতে পারি বলায়, নাম লিখে চল্‌লাম চারতলার এ্যাটিক্‌ কামরাগুলির অভিমুখে। মির্‌কোর ঘরে ছোট স্কাইলাইট-এর একমাত্র জানলা দিয়ে আলো তখনও আসেনি। কমজোরের একটা বাল্‌ব্‌ থেকে যেটুকু রশ্মি তার উপর পড়েছিল তাতে দেখাল যেন মির্‌কো ফুতোই-এ বসে ঘুমোচ্ছে। স্টেফান ঘরের মধ্যে যে পুলিসকর্মচারী উপস্থিত ছিল তাকে কি বলতে সে তার টর্চ ফোকাস্‌ করে মির্‌কোর দেহের উপর ফেল্ল। দেখলাম কাতহয়ে পড়া তার মাথার ডান কানের উপরে একটা বিভৎস ক্ষত এবং সেখান থেকে রক্তস্রোত কান, গাল, গলা বেয়ে সার্ট ও জামাকে রঞ্জিত করে জমিতে লিনোলিয়ামের উপর পড়ে চাপ বেঁধে গেছে। তার আধবোজা চোখ আর হাঁ করা মুখে যেন লেগে ছিল একটা ব্যঙ্গভরা হাসি।

আমরা বেরিয়ে আসবার সময় স্টেফান বলে উঠল—ষ্টুপিড্‌—ষ্টুপিড্‌। কিসের অথবা কা'র উদ্দেশ্যে এল তার এই খেদোক্তি জিজ্ঞাসা করিনি। সমস্ত জগতটাকেই তখন আমার মনে হচ্ছিল ষ্টুপিড্‌।

কালিদাসের কাব্যে ফুল

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আঠারো — অশোক

'পাদাহত প্রমোদয়া বিকশতাশোক'—সে কালে অশোক ফুল ফোটাতো নারীর চরণাঘাতে। তখন নারীদের পায়ে জুতো ওঠে নি, কুমুদের পাঁপড়ির মতো শুভ্র চরণদুটির প্রান্তদেশ রাঙা হোতো অলক্তকে। সে চরণের পরশনে অশোক কি কখনো ফুল না ফুটিয়ে পারে! একালেও অশোক ফুল ফোটায় কিন্তু সে আধুনিকাদের হিলওয়ালা-জুতো-পরা ঠিভঙ্গ চরণের স্পর্শে নয়। এদের চরণের স্পর্শে ফুল ফোটে না, ফুল শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে।

অশোক যে শুধু সেকালের বরাঙ্গনাদের প্রিয় ফুল ছিলো তা নয়, কালিদাসের প্রিয় ফুল ছিলো অশোক। তাঁর কাব্যে অশোক বার বার দেখা দিয়েছে। মেঘদূতম্‌-এর উত্তর মেঘ খণ্ডে মহাকবি বল্‌ছেন ঃ—

রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদন-মদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

সেথা রক্ত-অশোক বকুলেতে নব-পল্লব-শিহরণ,
মাধবীকুঞ্জ বিরাজে সেথায় কুরবকবীথিমাঝে,
অশোক সে চায় তোমার সখির বামপদপরশন,
ফুল ফোটাবার ছলেতে বকুল মুখের মদিরা যাচে।

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্‌'-এর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে অশোকের উল্লেখ রয়েছে বহুবার। তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভেই দেখি পরিচারিকা সমাহিতিকা বল্‌ছে—"এষা তপনীয়াশোকমবলোকয়ন্তী মধুকরিকা তিষ্ঠতি। যাবদেনাং সম্ভাবয়ামি ॥ ১ ॥

রক্ত অশোক তরুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মধুকরিকা। যাই, তাঁর সঙ্গে আলাপ করি গিয়ে। দুই সখিতে আলাপ চল্‌লো। দাড়িম্ব ফল নিয়ে সমাহিতিকা গমনোদ্যতা। তখন মধুকরিকা বল্লেন—"সখি! সমমেব গচ্ছাবঃ। অহমপাস্যা চিরায়মাণকুসুমোদ্গমস্য তপনীয়াশোকস্য দোহদনিমিত্তং দেব্যৈ নিবেদয়ামি ॥ ১০ ॥" "সখি! একটু দাঁড়াও, একসঙ্গে যাবো দুজনে। এই অশোক তরুতে ঠিক সময়ে ফুল ফোটে নি। আমি দেবীর কাছে গিয়ে অশোক তরুর দোহদ দেবার জন্যে আবেদন করবো।"

নৃপতি অগ্নিমিত্র বিদূষকের সঙ্গে উদ্যানে ভ্রমণ করছেন, এমন সময়ে মালবিকা এলেন সেই উদ্যানে। মালবিকা নিজের মনে নিজেকে সম্বোধন করে কতো না কথা বল্‌ছেন। প্রিয়তমকে অভিলাষ করে শুধু বেদনাই পেয়েছেন আর পেয়েছেন লজ্জা। এইসব কথা ভাবছেন, হঠাৎ মনে পড়ে গেলো দেবীর আদেশ—"অং আদিষ্টাস্মি দেব্যা,—গৌতমচাপলাদ্‌ দোলা-পরিভ্রষ্টায়া সরুজো সম চরণঃ। ন শক্নোমি। ত্বং তাবদ্‌ গত্বা তপনীয়াশোকস্য দোহদং নিবর্ত্তয় ইতি" ॥ ৩১ ॥ "আঃ, মনে পড়েছে। দেবী আমাকে আদেশ করে বলেছেন—"বিদূষকের চপলতায়

দোলা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে বড়ো ব্যথা পেয়েছি। তাই তুমি গিয়ে অশোক তরুর দোহদ সম্পন্ন করে এসো।"

উদ্যানে ঘুরতে ঘুরতে নজরে পড়লো অশোক তরু। মালবিকা—"অয়ং স সুকুমারদোহদাপেক্ষী অগৃহীত-কুসুম-নেপথ্য উৎকণ্ঠিতায়া মম অশোকঃ অনুকরোতি। যাবদস্য প্রচ্ছায়শীতলে শিলাপিট্টকে নিষন্না আত্মানং বিনোদয়ামি।" "এই সেই অশোক তরু। সুকুমার দোহদের অপেক্ষায় ফুলহীন এই অশোক আমারই মতো যেন কার অপেক্ষা করে আছে। যাই, ওর ছায়াতলে শিলাফলকে বসে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিই।"

প্রমোদ-কাননে নৃপতি অগ্নিমিত্র বেড়াচ্ছেন প্রিয় বয়স্য বিদূষককে নিয়ে। বসন্ত-লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের তারিফ করে বিদূষক বল্লেন যে সুন্দরীদের প্রসাধন-কলা বসন্ত-লক্ষ্মীর প্রসাধন-নৈপুণ্যের কাছে হার মেনে যায়। অগ্নিমিত্র বল্লেন যে বিদূষকের কথা খুবই ঠিক। তিনি অবাক হয়ে দেখছেন বসন্ত-লক্ষ্মীর সৌন্দর্য—

রক্তাশোকরুচা বিশেষিতগুণো বিম্বাধরালক্তকঃ
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকং শ্যামবদাতারুণম্।
আক্রান্তা তিলকক্রিয়াপি তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনৈঃ
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীর্মাধবী যোষিতাম্ ॥ ৩০ ॥

রক্ত অশোক নারী-অধরের লালিমা-গর্ব হরে,
শ্যাম-শ্বেত-লাল কুরবক দেয় পত্রলেখারে লাজ,
ললাট-তিলকে তিলক ফুলের অলি-শোভা ম্লান করে,
হতমান হোলো সুন্দরীদের প্রসাধন-কলা আজ।

মালবিকা প্রমোদকাননে বসে আছেন, সেখানে চরণের ভূষণ নিয়ে প্রবেশ করলো বকুলাবলিকা। মালবিকাকে বল্‌লো বকুলাবলিকা—সখি, একটি চরণ বাড়িয়ে দাও, আমি আল্‌তা দিয়ে পাখানি রাঙিয়ে নূপুর পরিয়ে দিই।

মালবিকা নীরব হয়ে কি করে সাজ-সজ্জার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাবেন তাই ভাবতে লাগলেন। মালবিকাকে নীরব দেখে বকুলাবলিকা বল্‌লো—"কিং বিচারয়সি? উৎসুকা খলু অস্য তপনীয়াশোকস্য কুসুমোদ্‌গমে দেবী ॥৫৭॥ কি ভাব্‌ছো সখি? এই রক্ত অশোকে ফুল ফোটাবার জন্যে দেবী বড়ই উৎসুক হয়ে আছেন।" নৃপতি আড়াল থেকে দুই সখির কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি বিদূষককে জিজ্ঞাসা করলেন—কথমশোকদোহদনিমিত্তোঽয়মারম্ভ?—অশোক তরুর দোহদের জন্যেই কি এসব ব্যাপার? বকুলাবলিকা মালবিকার কোনো আপত্তিই শুন্‌লো না, পাদুটিতে আল্‌তা পরিয়ে নূপুর দিয়ে সাজাতে লাগ্‌লো। এই দেখে বিদূষক বল্লেন যে মালবিকার সুন্দর চরণদুটির প্রসাধন করে যোগ্য কাজই করছে বকুলাবলিকা। রাজা বল্লেন—বয়স্য, তুমি ঠিকই বলেছ।

নবকিসলয়রাগেণার্দ্রপাদেন বালা স্ফুরিতনখরুচা দ্বৌ হন্তুমর্হত্যনেন।
অকুসুমিতমশোকং দোহদাপেক্ষয়া বা প্রণমিতশিরসং বা কান্তমার্দ্রাপরাধম্ ॥ ৬৪ ॥

নবকিশলয় সম আরক্ত প্রিয়া-পদ অনুপম,
ধবল-নখর-কিরণে চরণ উজ্জ্বল মনোহর,
দোহদ-প্রার্থী নি-ফুল অশোক, অপরাধী প্রিয়তম,
প্রিয়াই যোগ্য চরণ-আঘাত হানিতে দোঁহার পর ॥

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর চতুর্থ অঙ্কে বেদনা-ক্লিষ্টা শয্যাশায়িনী দেবীর কাছে রাজা গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে হঠাৎ আর্তস্বরে চীৎকার-রত বিদূষকের প্রবেশ—রক্ষা কর প্রভু, রক্ষা কর। দেবীকে শূন্য হাতে দর্শন করতে নেই, তাই ফুল তুল্‌তে গিয়েছিলুম, সাপে দংশন করেছে—তত্র অশোকস্তবককারণাৎ প্রসারিতঃ দক্ষিণহস্তঃ। ততঃ কোটর-বিনির্গতেন সর্পরূপিণা কালেন দষ্টোঽস্মি। ননু এতে দ্বে দংশনপদে ॥ ৪৮ ॥ উপবনে অশোক ফুল তোলবার জন্যে ডান হাতটি প্রসারিত করেছিলুম। অম্‌নি কোটর থেকে বের হয়ে সর্প-রূপী কাল আমাকে দংশন করলো। এই দেখ, দুটি দাঁতের চিহ্ন।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর পঞ্চম অঙ্ক সুরু হোলো উদ্যানপালিকাকে নিয়ে। উদ্যানপালিকা—উপক্ষিপ্ত ময়া সংস্কারবিধিনা তপনীয়াশোকস্য বেদিকাবন্ধঃ। যাবৎ অনুষ্ঠিতনিয়োগম্ আত্মানং দেব্যৈ নিবেদয়ামি। অহো দৈবস্য অনুকম্পনীয়া মালবিকা। তস্যাং তথা চণ্ডিকা দেবী অনেন অশোক-কুসুম-দোহদ-বৃত্তান্তেন প্রসাদোন্মুখী ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥ "দোহদের যে সব বিধান আছে সেই সব সংস্কার অনুযায়ী আমি রক্ত-অশোকের বেদী-রচনা করেছি। এখন দেবীকে খবর দিই গিয়ে। মালবিকার উপর দৈবের কি অনুগ্রহ! মালবিকার উপর দেবী এতো ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, কিন্তু অশোক তরুর দোহদের সংবাদ পেলেই তিনি প্রসন্না হবেন।"

উদ্যানপালিকা চলে যাবার পরেই প্রতীহারীর প্রবেশ। প্রতীহারী—আজ্ঞপ্তা অস্মি দেব্যা অশোকসৎকারব্যাপৃতয়া,—বিজ্ঞাপয় আর্য্যপুত্রম্। ইচ্ছামি আর্য্যপুত্রেণ সহ অশোকবৃক্ষকস্য প্রসূনলক্ষ্মীং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুম্ ॥ ১১ ॥

প্রতিহারী—অশোক তরুর সৎকারে ব্যাপৃতা দেবী আমাকে আদেশ করেছেন—আর্যপুত্রকে বলো গিয়ে যে আমি তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে অশোকতরুর কুসুমশোভা দেখতে ইচ্ছা করি।"

রাজার কাছে গিয়ে প্রতিহারী বল্‌লো—"জয়তু জয়তু দেবঃ। দেবী বিজ্ঞাপয়তি, তপনীয়াশোকস্য কুসুমোদ্গমশ্রিয়ম্ আর্য্যপুত্রেণ সহ প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছামি ইতি ॥ ২০ ॥ "জয় হোক মহারাজের। দেবী আপনাকে জানিয়েছেন যে তিনি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে রক্তাশোক তরুতে যে ফুল ফুটেছে তা দেখতে বাসনা করেন।"

নৃপতি সানন্দে সম্মতিজ্ঞাপন করে বিদূষককে নিয়ে প্রমোদবনে বিচরণ করতে লাগলেন।

বিদূষক বল্লেন—অহো! অয়ং সঃ দত্ত-নেপথ্যঃ ইব কুসুম-স্তবকৈঃ তপনীয়াশোকঃ। আলোকয়তু ভবান্ ॥ ২৭ ॥ "অহো! গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুমে অশোক তরুকে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে। দেখুন মহারাজ।"

রাজা বল্লেন—যথা সময়ে এই অশোক তরুতে ফুল না ফুটে ভালোই হয়েছে, নইলে এর এমন অনন্যসাধারণ শোভা হোতো কি করে দেখ

সর্ব্বশোকলতানাং প্রথমং সূচিতবসন্তবিভবানাম্।
নির্বৃত্তদোহদেঽস্মিন্ সংক্রান্তানীব মুকুলানি ॥ ২৮ ॥

মনে হয় এই অশোক তরুর দোহদ হয়েছে সারা
সকল অশোকে বসন্ত-শোভা সূচিত হওয়ার পর,
সকল অশোক তরুর মুকুল তাই গো আত্মহারা
এই অশোকেতে ফুটিয়া উঠেছে অপরূপ মনোহর।

বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এর চতুর্থ অঙ্কে কালিদাস উর্বশী-বিরহ-কাতর নৃপতি পুরুরবার বিরহাবস্থার কমনীয় ছবি এঁকেছেন। স্বর্গের এক সরোবরতীরে চিত্রলেখা ও সহজন্যা উর্বশীর বিরহে

সন্তপ্তা হয়ে বিলাপ-রতা। সেই সরোবর-তীরে উর্বশী-অন্বেষণ-রত রাজা পুরূরবা এসে হাজির। পাগলের মতো তিনি যা কিছু দেখছেন তাকেই উর্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করছেন। বিদ্যুৎকে উর্বশী বলে ভ্রম করে ধরতে যাচ্ছেন। ময়ূরকে দেখে, কোকিলকে দেখে উর্বশীর সন্ধান তারা জানে কিনা শুধোচ্ছেন। হংসবলাকা মানস-গমনে উৎসুক, রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করছেন উর্বশীর সন্ধান। রক্তকদম্ব দেখে পুরূরবার মনে হোলো যে তিনি এতোদিনে তাঁর প্রেয়সীর পথের সন্ধান পেয়েছেন। অকস্মাৎ নজরে পড়লো পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে থেকে রক্তবর্ণ কি একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে। একবার মনে হোলো ওটা হয়তো সিংহ কর্তৃক খণ্ডিত হাতীর শুঁড়ের রক্তাক্ত একটি অংশ অথবা আগুনের ফুল্‌কি। তারপরে ভ্রম বুঝতে পারলেন রাজা—অয়ে! রক্তাশোকস্তবকসমরাগো মণিরয়ং যমুদ্ধর্তুং পুষা ব্যবসিত ইবালম্বিতকরঃ॥ ৮৪॥ —ওঃ বুঝেছি, রক্তবরণ অশোক ফুলের মতো রক্তিম একটি মণি। সেই মণি থেকেই এই প্রভা বিকীর্ণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই মণিটিকে ধরবার জন্যে সূর্য তাঁর কিরণ-রূপ হস্ত প্রসারিত করেছেন।

কুমারসম্ভবম্‌-এর তৃতীয় সর্গে অশোকের দেখা পাই। মদন, বসন্ত ও রতি যখন মহাদেব যে তপোবনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেখানে প্রবেশ করলেন তখন নিমেষের মধ্যে সেই তপোবনের চেহারা বদল হয়ে গেলো—

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ
স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপেক্ষত সুন্দরীনাং
সম্পর্কমাসিঞ্চিত নূপুরেন ॥ ২৬ ॥

ফোটালো অশোক অসংখ্য ফুল অকাল বসন্তে
শাখামূল হতে কিশলয়ে ফুলে অশোক উঠিল ভরে,
সুন্দরীদের নূপুর-মুখর চরণ-পরশ লাগি
অপেখিতে নাহি হোলো অশোকেরে ফুল ফুটাবার তরে।

উমা যখন মহাদেবের অর্চনা করবার জন্যে তাঁর তপোবনে যাবার সংকল্প করলেন তখন নানা ফুলের আভরণে নিজেকে সাজিয়েছিলেন। রক্তিম অশোক ফুল উমার দেহে আভরণ হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয় নি—অশোকনির্ভর্ৎসিতপদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতি কর্ণিকারম্‌।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী ॥৫৩॥

অশোক ফুলে পদ্মরাগ মাণিক হোলো লাঞ্ছিত
কর্ণিকার নিলো সোনার স্থান,
সিন্ধুবার রাজিলো যেথা মুকুতা হতো বাঞ্ছিত
ফাগুন-কুসুম দিল দেহে অবদান।

ঋতুসংহারম্‌-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-শোভা-বর্ণনায়ে অশোক বাদ পড়েনি —

শ্যামালতাঃ কুসুমভারনতাপ্রবালাঃ
স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভূষণ বাহু কান্তিম্‌।
দণ্ডাবভাসবিশদস্মিত চন্দ্র কান্তিং
কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরানবমালতী চ ॥১৮॥

নবকিশলয় কুসুমের ভারে নুয়ে পড়া শ্যামালতা,
তার কাছে হারে রমণী-বাহুর আভরণ-পরা শোভা,
অশোক কুসুম নব বিকশিত ফুল্ল মালতী ফুল
হরিতেছে আজ নারীর হাসির কান্তি চিত্ত-লোভা।

বসন্তের দিনেও অশোক নারী-দেহের সঙ্গলাভে বঞ্চিত নয়। ঋতুসংহারম্‌-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্ত-বর্ণনায় কবি বলছেন :—কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং
চলেষু নীলেষলকেষদুশোকম্‌।
পুংপক্ষ ফুল্লম্‌ নবমল্লিকায়াঃ
প্রয়াতি কান্তি প্রমদাজনস্য ॥৫॥

নারীর কর্ণ-ভূষণ-যোগ্য কুসুম কর্ণিকার,
ঘন কালোকেশ-ভূষণ অশোক ফুল,
নবমল্লিকা তরুটি ভরিয়া ফোটে যে কুসুম শোভা
রূপে ভরে এরা নারীর দেহের কূল।

অশোক শুধু রূপের সাজে সাজায় না নারীদের, তাদের অন্তরে স্মৃতি জাগিয়ে বিরহের অনলে দগ্ধ করে তাদের হিয়া — আ মূলতো বিদ্রুমরাগতাম্রং,
সপল্লবাঃ পুষ্পচয়ং দধানাঃ।
কুর্বন্ত্যশোকা হৃদয়ং সশোকং
নিরীক্ষমাণা নব যৌবনানাম্‌ ॥১৬॥

প্রবালের মতো রক্তবরণ কুসুমে মোহন সাজি,
অশোক শ্যামল-পল্লব-সুশোভিত,
নবযৌবনা রমণীরা যবে হেরিছে অশোক পানে
বেদনার রসে ভরিছে তাদের চিত।

'রঘুবংশম্‌'-এর অষ্টম সর্গে অজ বিলাপ করছেন ইন্দুমতীর মৃত্যুতে :—
কুসুমং কৃত দোহদস্তয়া যদশোকোঽয়মুদীরয়িষ্যতি।
অলকাভরণং কথং নু তত্তব নেষ্যামি নিবাপমাল্যতাম ॥৬২॥

চরণ-আঘাতে দোহদ করিলে যে অশোকে তুমি প্রিয়া
যে অশোক ফুলে রচিতে তোমার কবরীর আভরণ,
সে অশোক তরু নবকুসুমেতে উঠিবে উজ্জ্বলিয়া,
সেই ফুল-মালা রচিবে কি তব অন্তিম আবরণ!

স্মরতেব সশব্দনূপুরং চরণানুগ্রহমন্যদুর্লভম্‌।
অমুনাকুসুমাশ্রুবর্ষিণা ত্বমশোকেন সূচ্যসে শোচ্যসে ॥৬৩॥

চেয়ে দেখো প্রিয়া ঐ সে অশোক বিকশিত নবলোকে
তোমার নূপুর-রণন-মুখর চরণ-পরশ স্মরি

অশ্রুবিন্দু করিতেছে ত্যাগ তোমার বিরহ-শোকে
দুর্লভ তব চরণ-পরশ-স্মৃতি আছে হিয়া ভরি।

রঘুবংশম্-এর নবম সর্গে অযোধ্যায় বসন্তের আবির্ভাবের বর্ণনা করে কালিদাস বলছেন ঃ—

কুসুমমেব ন কেবলমার্তবং নবমশোকতরোঃ স্মরদীপনম্।
কিসলয়প্রসবোঽপি বিলাসিনাং মদয়িতা দয়িতাশ্রবণার্পিতঃ ॥২৮॥

নবপ্রস্ফুট অশোক কুসুম নববসন্তদিনে
শুধু সে-ই নাহি জাগায় কামের সকলের অন্তরে
প্রিয়ার কর্ণে শোভে অশোকের যে রঙীন কিশলয়
সেই কিশলয় উন্মাদনায় বিলাসীর হিয়া ভরে।

উনিশ — মন্দার পারিজাত সন্তানক

হরিচন্দন, কল্পতরু, মন্দার, পারিজাত ও সন্তানক — এই পাঁচটি হচ্ছে স্বর্গের নন্দনবনের দেবতরু। কালিদাসের রচনায় স্বর্গের বর্ণনা রয়েছে নানা কাব্যে ও নাটকে। তাই নন্দনের ফুল-গুলি কবির কল্পনার স্রোত বেয়ে নেমে এসেছে তাঁর কাব্যের মধ্যে। পাঁচটি দেবতরুর মধ্যে তিনটি দেবতরুর ফুলের সন্ধান পাই মহাকবির রচনায়। হরিচন্দন ও কল্পবৃক্ষের উল্লেখ আছে তাঁর রচনায়, কিন্তু তাদের ফুলের কথা নেই তাঁর কাব্যে।

মেঘদূতম্-এর উত্তর মেঘ খণ্ডে অভিসারিকাদের অভিসারের বর্ণনা করে যক্ষ মেঘকে বলছেন ঃ—গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দার পুষ্পৈঃ

পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈঃ
নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম ॥ ১১ ॥

চলার বেগেতে কেশ হতে ঝরে পড়ে পথে মন্দার,
ঝরে কর্ণের স্বর্ণকমল, বুকের পত্রলেখা,
লুটায় ধূলায় মুক্তার জাল, ছিন্ন কণ্ঠ-হার,
প্রভাতের বুকে অভিসারিকার শর্বরী-লীলা লেখা।

কুমার সম্ভবম্-এর পঞ্চম সর্গে পার্বতী শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলছেন ঃ—

অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ প্রতিস্রদিগ্বারণ-বাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা বিনিদ্রমন্দাররজোঽরুণাংগুলী ॥ ৮০ ॥

বৃষ চড়ি যবে পথ চলে যান দরিদ্র শংকর
গজ হতে নামি প্রণমে ইন্দ্র শিবের চরণে লুটি
প্রণতির কালে ইন্দ্র-মুকুটে শোভে যেই মন্দার,
তার পরাগেতে রঞ্জিত হয় শিবের চরণদুটি।

কুমারসম্ভবম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বর্ণনা আছে আকাশ-গংগা মন্দাকিনীর। সপ্তর্ষিরা শিবের তপোবনে আসছেন মন্দাকিনীর কি অপূর্ব শোভা! ঃ—

আপ্লুতাস্তীর-মন্দার-কুসুমোৎকির-বীচিষু।
ব্যোমগংগাপ্রবাহেষু দিঙ্নাগমদগন্ধিষু ॥৫॥

তীর হতে উড়ে আসে নদীবুকে মন্দার ফুল দল,
মন্দাকিনীর ঊর্মির বুকে ফুলদল খেলা করে,
দিঙনাগদের মদবারি-ঝরা সুগন্ধ নদী-জল,
তাহে স্নান করি সপ্ত ঋষিরা আসেন শিবের তরে।

রঘুবংশম্-এর ষষ্ঠ সর্গে কালিদাস ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের ছবি এঁকেছেন। স্বয়ংবর সভায় ইন্দুমতীর সখি সুনন্দা এক এক করে রাজাদের পরিচয় দিচ্ছেন ইন্দুমতীকে। রাজা পরন্তপের পরিচয় দিয়ে সুনন্দা বলছেন ঃ— ক্রিয়াপ্রবন্ধাদয়মধ্বরাণামজস্রমাহূতসহস্রনেত্রঃ।
শচ্যাশ্চিরং পাণ্ডুকপোললম্বান্মন্দারশূন্যালকাংশ্চকার ॥২৩॥

যজ্ঞের পর যজ্ঞ করিত নৃপতি পরন্তপ,
ইন্দ্রের ডাক পড়িতো নিত্য যজ্ঞের সভাতলে,
শচীর পাণ্ডু কপোলের পরে যে অলক দুলে মরে,
মন্দার ফুল আর শোভেনাকো হায় সেই কুন্তলে।

রাজা পুরূরবা সৌরলোক থেকে আকাশ-পথে নিজের রাজধানীতে ফিরে আসছেন। পথে নারীর ক্রন্দন শুনে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে কেশি নামক দানব উর্বশীকে হরণ করে নিয়ে গেছে তাই সখিরা কাঁদছে। রাজা পুরূরবা উর্বশীকে উদ্ধার করলেন দানবের হাত থেকে। দানবের হাত থেকে রক্ষা পাবার পরেও উর্বশীর যে বিকল অবস্থা, তার বর্ণনা করেছেন কালিদাস বিক্রমোর্বশীয়ম-এর প্রথম অঙ্কে ঃ—

মন্দারকুসুমোদ্দাম্না গুরুরস্যাঃ সূচ্যতে হৃদয়কম্পঃ।
মুহুরুচ্ছ্বসতা মধ্যে পরিণাহবতোঃ পয়োধরয়োঃ ॥ ৩৫ ॥

পয়োধর-মাঝে কেঁপে কেঁপে ওঠে মন্দার মালাখানি,
পরাণ কাঁপিছে থর থর তাহে সহজেই অনুমানি।

উর্বশীর বিরহে পাগল প্রায় হয়ে নৃপতি পুরূরবা তাঁর সন্ধানে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিক্রমোর্বশীয়ম্-এর চতুর্থ অঙ্কে বিরহ-কাতর পুরূরবার বর্ণনা করেছেন কালিদাস। একটি অপরূপ মণি পেয়েছেন পুরূরবা। সেই মণিটি নিয়ে তিনি বিলাপ করছেন ঃ—

মন্দারপুষ্পৈরধিবাসিতায়াং যস্যাঃ শিখায়াময়মর্পণীয়ঃ।
সৈব প্রিয়া সম্প্রতি দুর্লভা মে মৈবৈনমশ্রুপহতং করোমি ॥৮৬॥

মন্দার ফুল-শোভিত প্রিয়ার সুন্দর সীঁথিপরে
এই মণিখানি সাজাতে স্নেহাগে আমার পরাণ চায়,
সেই প্রিয়া মোর দুর্লভ আজ, আর তো পাবো না ওরে,
শুধু আঁখিজলে এই মণিখানি মলিন করিনু হায়।

স্বর্গ থেকে মর্তে আসছেন রাজা দুষ্মন্ত। স্বর্গে দেবরাজ তাঁকে কতো সমাদরে অভ্যর্থনা করেছেন, তাঁর সিংহাসনের আধখানিতে দুষ্মন্তকে বসিয়ে কী প্রীতিই না তাঁকে দেখিয়েছেন—

এই সব বর্ণনা করে দুষ্মন্ত মাতলিকে বল্‌ছেন ঃ—

অন্তর্গত প্রার্থনামন্তকস্থং জয়ন্তমুদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন।
আমৃষ্টবক্ষো হরিচন্দনাঙ্কা মন্দার মালা হরিণা পিনদ্ধা ॥৩॥

হরিচন্দন-চর্চিত বুকে শোভে মন্দার মালা।
চন্দন-মাখা মন্দারমালা কণ্ঠ হইতে খুলি
পরালেন মোর গলে দেবরাজ মালিকা সোহাগ-ঢালা।
মালা-অভিলাষী জয়ন্ত পানে হাসি-ভরা মুখ তুলি।

উমার বিবাহের দিন ওষধিপ্রস্থনগর অভিনব সাজে সেজেছে। কুমারসম্ভবম্‌-এর সপ্তম্ সর্গে নগাধিরাজ হিমালয়ের রাজধানী ওষধিপ্রস্থ নগরের বর্ণনা করে কবি বলছেন ঃ—

সন্তানকাকীর্ণ মহাপথং ত চ্চীনাংশুকৈঃ কল্পিত কেতুমালম্‌।
ভাসোজ্জ্বলাৎ কাঞ্চনতোরণানাং স্থানান্তরং স্বর্গং ইবাবভাসে ॥৩॥

চীনাংশুকের পতাকা মালায় সজ্জিত হোলো পথ,
হোলো রাজপথ সন্তান তরু কুসুমেতে সমাকীর্ণ,
স্বর্ণতোরণে উজ্জ্বল হোল নগরীর রাজপথ,
মনে হোল যেন স্বর্গ হয়েছে ধরাতলে অবতীর্ণ।

রামের জন্মক্ষণে দেবতারা আকাশ থেকে সন্তানক-কুসুমের পুষ্প-বৃষ্টি করলেন। রঘুবংশম্‌-এর দশম সর্গে তার বর্ণনা আছে ঃ—

সন্তানকময়ী বৃষ্টির্ভবনে চাস্য পেতুষী
সন্মঙ্গলোপচারাণাং সৈবাদিরচনাভবৎ ॥৭৭॥

আকাশ হইতে রাজপুরী পরে ঝরে সন্তান ফুল,
সন্তান তরু পুষ্প-বৃষ্টি স্বর্গ হইতে ঝরে,
রামের জন্ম ক্ষণে দেবতারা আনন্দে সমাকুল
সর্বপ্রথমে শুভ উপচারে তার বন্দনা করে।

কুমারসম্ভবম্‌-এর অষ্টম সর্গে মহাদেব নিজ হাতে পার্বতীকে কেমন করে পারিজাত কুসুম দিয়ে সাজাতেন তার বর্ণনা করেছেন কবি—

তাং পুলোমতনয়ালকোচিতৈঃ পারিজাতকুসুমৈঃ প্রসাধয়ন্‌।
নন্দনে চিরময়ুখলোচনঃ সস্পৃহং সুরবধূভিরীক্ষিতঃ ॥ ২৭ ॥

শচীর অলকে শোভিত নিত্য যে মোহন পারিজাত
সেই পারিজাতে সাজাতেন শিব গৌরীরে নিজ হাতে,
সুরবধূদল তাকায়ে দেখিত আকুল কামনা সাথ,
নন্দনবনে ভ্রমিতেন শিব যবে গৌরীর সাথে।

পুরূরবা বয়স্য বিদূষককে নিয়ে ঘুরছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষ থেকে উর্বশীর লিপি এসে পড়লো তাঁর সামনে। বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্‌-এর দ্বিতীয় অঙ্কে সেই লিপির বর্ণনা করেছেন কবি ঃ— স্বামিন্‌! সম্ভাবিতা যথাহং ত্বয়া অজ্ঞাত্রী

তথা চানুরক্তস্য সুভগ এবমেব তব।
অনন্তরং ন মে ললিত পারিজাতশয়নীয়ে
ভবন্তি সুখা নন্দনবনবাতা অপি শিখীব শরীরে ॥ ১০১ ॥

বুঝি নি তোমার হৃদয়ের কথা ভাবিয়াছ অনুখন,
আমারও প্রাণের বাসনা বোঝ নি সদা ভেবেছিনু আমি,
তাই পারিজাত ফুলের শয্যা নন্দনসমীরণ,
অগ্নিশিখার দহনে জ্বলেছে দেহমন দিনযামী।

কুড়ি — কোবিদার

কোবিদারের পরিচয় দিতে গিয়ে অমরকোষরচয়িতা বলেছেন—কোবিদারে চমরিকঃ কুদ্দালো যুগ্মপত্রকঃ অর্থাৎ কোবিদার জোড়া-পাতার গাছ, ফুলগুলি তার রোমের মতো। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞদের মতে একালের কাঞ্চন সেকালে গুরুগম্ভীর কোবিদার নাম নিয়ে উজ্জয়িনীর রাজসভায় নিজর স্থান করে নিয়েছিল। ঋতুসংহারম্‌-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় কোবিদারের প্রাণ-ভোলানো রূপের কথা ছন্দোবদ্ধ হয়েছে ঃ—

মন্দানিলাকুলিতচারুতরাগ্রশখেঃ পুষ্পোদ্‌গমপ্রচয়কোমলপল্লাবাগ্রঃ
মত্ত দ্বিরেফপরিপীতমধুপ্রসেকশ্চিত্তং বিদারয়তি কস্য ন কোবিদারঃ ॥ ৬ ॥

মন্দপবনে মৃদু-কম্পিত শাখার অগ্রগুলি
নব কিশলয়ে কুসুমে মোহন সাজি
মত্তভ্রমরে মধুদানে রত কোবিদার তরুগুলি
করে বিদীর্ণ কার না চিত্ত আজি!

একুশ — শিলীন্ধ্রা

শিলীন্ধ্রা ধরণীর বুক বিদীর্ণ করে ফোটে নবধারাবর্ষণে। শিলীন্ধ্রা, কন্দলী আমাদের ভূঁইচাপার রাজকীয় দুটি নাম।

মেঘদূতম্‌-এর পূর্বমেঘ খন্ডে যে পথ দিয়ে মেঘ কৈলাসে যাচ্ছে সেই পথে দুবার ভূঁইচাপার দেখা পাই ঃ—

কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বাসে শ্রবণসুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।
আকৈলাসাৎ বিস-কিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১ ॥

মেঘগর্জনে ফোটে ভূঁইচাপা ধরণীর বুক চিরে,
হংসবলাকা মেঘগর্জনে মানসের লাগি মাতি
মৃণাল পাথেয় লয়ে যবে ধায় মানস-সরসীতীরে
কৈলাসগিরিযাত্রী তোমার হবে মরালেরা সাথী।

শুধু কি তাই? মেঘবর্ষণে হরিতকপিশ নীপকেশর দেখা দেবে নীপবনে, তাই দেখে ভূঁইচাপা-কলি রোমন্থন করতে করতে হরিণহরিণীরা বনতলে ঘুরে বেড়াবে ঃ—

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢ়ৈ
রাবির্ভূত প্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেঽধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥ ২১ ॥

হেরি হরিতকপিশ নীপের কেশর প্রস্ফুট অম্লান,
নব-প্রস্ফুট ভূঁইচাপা-কলি সুখে চর্বণ-রত,
হরিণহরিণী নেয় আনন্দে সিক্ত মাটির ঘ্রাণ,
দেখায় তাহারা বর্ষণ-ধারা-সিক্ত তোমার পথ।

রঘুবংশম্-এর ত্রয়োদশ সর্গে লঙ্কা থেকে সীতাকে নিয়ে রামের অযোধ্যায় ফিরে আসবার ছবি এঁকেছেন কালিদাস। পুষ্পকরথে চড়ে আসবার সময় রাম সীতাকে সব গিরিনদীবন ও জনপদের সঙ্গে পরিচিত করে দিচ্ছেন। কোথাও সমুদ্র, কোথাও বা পর্বত ঃ—

আসারসিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাৎ
মামক্ষিণোৎ যত্র বিভিন্নকোশৈঃ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে বিবাহধুমারুণলোচন-শ্রী ॥ ২৯ ॥

মাল্যবান গিরির শিখরে নবধারাবরিষণে
মৃত্তিকা হতে ধোঁয়ালি বাষ্প ওঠে আকাশের পানে,
ধোঁয়ালি বাষ্প মেশে যবে এসে লাল ভূঁইচাপা সনে,
বিবাহ-অগ্নি-ধূমে রক্তিম তব আঁখি মনে আনে।

রক্ত-বরণ ভূঁইচাপা সদ্যপ্রস্ফুট, ভূঁইচাপার মধ্যে বৃষ্টিবিন্দু টলটল্ করছে। তাই দেখে বিরহী পুরুরবার উর্বশীর সজল রক্তিম নয়নদুটি মনে পড়ে গেলো ঃ—

আরক্তকোটিভিরিয়ং কুসুমৈর্নবকন্দলীর্মলিনগর্ভৈঃ।
কোপাদন্তর্বাষ্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তস্যাঃ ॥ ৩২ ॥

রক্তিম নবকন্দলীফুল মাঝে
বৃষ্টি-বিন্দু ধরেছে অমল শোভা,
স্মরণেতে আনে ক্রোধ-রক্তিম আঁখিদুটি প্রেয়সীর,
সজল নয়ন রক্তিম মনলোভা।

(ক্রমশঃ)

কমলাদি'

প্রকাশ পাল

কথায় কথায় কমলাদি বললেন —

'হ্যাঁ, সম্মানটা বাঁচানোই বড় কথা। সম্মানটাই হচ্ছে মেয়েমানুষের আসল বস্তু।'

বলে আমার দিকে চেয়ে একটু মৃদু হাসলেন কমলাদি। আমি ওঁকে ছোট বেলা থেকে চিনি। আমি জানি এই একটুকুরো হাসি দিয়ে জীবনের কত বড় একটা কান্নাকে চাপলেন উনি। কমলাদি এখন বিধবা। বছর তেত্রিশ চৌত্রিশ বয়স। চোয়াল উঁচু। গালবসা, চশমা আঁটা মুখ। শরীরটা একটুকুরো কাঠের মত। রসকষহীন, শান্ত, গম্ভীর।

এই কমলাদিকেও একদিন বরপক্ষ দেখতে এসেছিল। কনেকে দেখতে আসা অবশ্য এমন কিছু বিচিত্র নয়। কমলাদি যখন বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ে তখন তাকেই বা পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে না কেন? কথাটা সে নিয়ে নয়।

কমলাদিকে যখন পাত্রপক্ষ দেখতে এলো তখন তাকে দেখে বিয়ে করার দিন গত। বয়সটা তিরিশের দিকে ঢলে পড় পড়। লোয়ার প্রাইমারী ইস্কুলে বছর আষ্টেক মাষ্টারী করা কমলাদি যদি চোখতুলে কাউকে তখন দেখে তার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়। বাচ্চাগুলোকে ডিসিপ্লিনে রেখে রেখে কমলাদির চেহারাটাই কেমন শক্ত হয়ে গেছে। পুরু কাঁচের চশমা আঁটা শুকনো গালভাঙ্গা কমলাদির মুখখানা দেখে চট করে কারো ভালো লাগার কথা নয়। রংটা একটু ফর্সা বটে তবে চামড়াটা আবার কেমন যেন মরা মরা।

এই কমলাদিকে সত্যিই যেদিন দেখতে আসা উচিৎ ছিল সেদিন কেউ আসে নি। মা-মরা মেয়ের মাথার ওপর স্ত্রীহারা উদাসীন বাবা। কমলাদির সতেরো বছরের দেহে যেদিন যৌবনের ঢল নেমেছিল সেদিন যদি কেউ দেখতে আসতো হয়তো 'দূরছাই' বলে মুখ ফেরাতো না। ডানা-কাটা পরী না হোক্ গেরস্ত ঘরের লক্ষীমন্ত বউ বলে হয়তো বেমানান্ লাগতো না ওকে......... কিন্তু দিন গেল, মাস গেল, বছরও গেল কেউ এলো না। বাবা কোন চেষ্টাই করলেন না। কমলাদির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওর মেজো বোন রমলা আর ছোট বোন বিমলাও বড় হয়ে উঠতে লাগলো তবু কমলাদিকে দেখতে এলো না কেউ।

বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসে কাকা একবার বলেছিলেন 'মেয়ের বিয়ে দাও'

বাবা বলেছিলেন 'দোব'

ব্যস্ ওই পর্যন্ত। এর বেশি কোন কথা হয় নি। তারপর হঠাৎ সেই উদাসীন বাবাও মারা গেলেন। রেখে গেলেন কমলাদির নীচে একভাই আর দু দুটো বোনকে। বাড়ির ক্যাশবাক্সটাও তিনি শূন্য করেই রেখে গেলেন। সুযোগ বুঝে ভাইটাকেও টিবিতে পেয়ে বসলো। এ হেন দুসময়ে কারা কমলাদিকে দেখতে আসবে? এত দায় পড়ে নি কারো।

এসব দিনগুলোকে পরবর্তী জীবনে মনে করতে চায় না কমলাদি। মনে হয় ভাগ্যিস ওর মাট্রিকটা পাশ করা ছিল তাইতো একাত্তরটাকা মাইনের এই চাকরীটা তখন হয়েছিল।

সে সব দিনগুলো এক সময় কাটিয়ে দিল কমলাদি। দুঃখেই যাক্ আর সুখেই যাক কেটে গেল দিনগুলো। ছোট ভাই হাঁসপাতাল থেকে টিবি সেরে এলো—ভুবনেশ্বর অঞ্চলে একটা চাকরীও পেলো সে। আয় তেমন বেশি নয়, না, হোক্, চাকরীটায় খাটুনী কম, আর

ডাক্তাররা বলেছেন টিবি রুগী সেরে ওঠার পর ও জায়গাটার জলবায়ু আফটার কেয়ারের পক্ষে খুব ভালো কাজ করবে। অবশ্য সাহায্য কিছু হবেনা—কারণ মাইনের টাকাটা ওর নিজের ভালোমন্দ খেয়ে আর ভালোভাবে থেকেই বেরিয়ে যাবে। তা হোক্ ওর সাহায্যে কমলাদির প্রয়োজনও ছিল না আর। ওরই মত রমলাও একটা চাকরী পেয়েছিল টাঁচারীর। অতএব তখন খানিকটা নিশ্চিন্ততা এসেছিল কমলাদিদের জীবনে। তাই জীবনের স্রেফ বাঁচার দিকটা ছেড়ে অন্যদিকগুলোর দিকে নজর দেবার সময় হয়েছিল সবাইয়ের।

অতএব কমলাদির বাবার যে কাজটা করা উচিত ছিল দশবছর আগে দশবছর পরে কমলাদির ছোটভাই সেই কাজটার উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলো। তারই আগ্রহে আর কমলাদির চেয়ে একবছরের বড় এক খুড়তুতো বোনের চেষ্টায় দশবছর আগে যা মানাতো সেই ভঙ্গীতে ব্রীড়া-নম্রমুখে আস্তে আস্তে পাত্রপক্ষের সামনে এসে বসলো মেয়ে ইস্কুলের কড়া টাঁচার কমলাদি। বসলো পরীক্ষা দিতে।

পাত্ররা সেদিন চলে গেল। কিন্তু আশ্চর্য কথা যে তারা পছন্দ করে গেল কমলাদিকে। বলে গেল সে কথা সামনেই। কমলাদির কাকা এসে ভাবী বেয়াইয়ের কাছে দাঁড়াতে তিনি বললেন, 'এটা আশ্বিন, সামনের অঘ্রানের প্রথম সপ্তাহে যে দিন আছে তাতেই লাগিয়ে দোব।'

কমলাদির ছোটবোনেরা দিদিকে যমের মত ভয় করতো। ওর কাছে ইয়ার্কিঠাট্টার ধার দিয়েও যেতো না তারা। ভরসা না পেয়ে দিদির মনের খবরটা জানতে পাঠালো বড়দিকে অর্থাৎ কমলাদির চেয়ে একবছরের বড় সেই খুড়তুতো দিদিকে।

বড়দি বললো—'কিলো? ভাবী নাগরকে পছন্দ হোল তোর?' এ দিদির ধরণটা একটু গোঁয়ো। কমলাদি এসব নোংরা অমার্জিত ধরণের কথাবার্তা ভারি অপছন্দ করতো।

রমলা বিমলা দূরু দূরু বুকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, এই বুঝি কিছু হয় হয়। একটা হুঙ্কার দিয়েই বা ওঠে কমলাদি।

ওদের আশ্চর্য করে দিয়ে আশ্চর্য রসাল গলায় কমলাদি বললো "ওর মধ্যে অনেকজনই তো ছিল, কোনটি আমার নাগর তাতো বুঝলুম না।"

'ওমা ওই তো ষেটি চশমাপরা পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের! বেশ দেখতে না লো?'

'আমার চেয়ে তোর নোলায় জল বেশি পড়ছে। জামাইবাবু পুরোনো হয়ে গেছে বুঝি?'

রমলা বিমলা প্রায় নাচে আর কি! মরা গাছেও দখিন হাওয়া দোলা দেয় তাহলে? শুকনো মাস্টারণীর প্রাণেও মদনদেবের প্রভাব পড়ে!

বিয়ের উদ্যোগপর্বটা সবাই মিলে ঘটা করেই সুরু করেছিল। খবরটা রটতে দেরি হয়নি। সন্ধ্যেবেলা কমলাদির সহকর্মিরা এসে শুভকামনা জানিয়ে গেল। কমলাদির মনে হোল সে আর মাস্টারণী নেই। তার দেহের ওপর চাপানো একটা গুরুভার যেন সহসা কে সরিয়ে নিয়েছে। মনটা হঠাৎ যেন হাল্কা হয়ে গেল।

হেডমাস্টার মশাই একটু রাতের দিকে একটা ফুলের তোড়া নিয়ে এলেন। কমলাদি বললো 'একি মাস্টারমশাই!' হেডমাস্টার বললেন 'শুভাভিনিসের সূচনা ফুল দিয়েই হয়। বড় পবিত্র বড় সুন্দর বস্তু। খবরটা পেয়ে নিয়ে এলুম আপনাকে দিতে। অরুণা তোড়া বেঁধে দিয়েছে কমলাদিদির জন্যে—'

অরুণা ওঁর বড়মেয়ের মেয়ে।

হেডমাস্টার মশাই হাইস্কুলের হেডমাস্টার। কমলাদিদের লোয়ার প্রাইমারী বিভাগটা ছিল হাইস্কুলেরই একটা অংশ। ওঁকে কমলাদির বেশ ভালোই লাগতো। সদাহাস্যময় বিপত্নীক

ভদ্রলোক। ষাটের ওপর বয়স। ছেলে নেই। মেয়েদের নিয়ে সংসার। তাদের সবারই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাপের কাছে এসে মেয়েরা মাঝে মাঝে কেউ থাকে।

ইস্কুলের সহকর্মীদের সঙ্গে ভারি অমায়িক ব্যবহার ওঁর। তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারে বেশ দরদ প্রকাশ পেতো। শিক্ষয়িত্রীদের খুব স্নেহের চোখে দেখতেন ..... কিন্তু কমলাদিকে যে একটু বেশি স্নেহ দেখাতেন বরাবর, এটা কমলাদি যেমন বুঝেছিল অন্যদের কাছেও তেমনি চাপা ছিল না। তাই আবেদন নিবেদন থাকলে সকলের হয়ে দরবার করতে হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে কমলাদিকেই পাঠানো হোত। আর কাজও হোত তাতে।

কিন্তু কমলাদির যারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু তারা বলতো 'এটা ভাল নয়'

কমলাদি বলতো 'কোন্‌টা?'

'এই হেডমাষ্টারের তোর সঙ্গে গায়ে পড়া ভাবটা'

কমলাদির মুখের ভাবটা নিমেষে বদলে যেতো। কঠিন গলায় বলতো "বড় নোংরা তোদের মনটা, দেখিস নি ওঁর বয়সটা ষাটের ওপর"

'তা হোক্, তবু পুরুষ মানুষ আর তুই আইবুড়ো যুবতী মেয়ে' কমলাদি এর জবাবে শুধু বলেছিল 'ছিঃ'!

কমলাদিকে ঘাঁটায়নি কেউ আর।

কিন্তু ভদ্রলোক একটু বেশি যে গায়েপড়া এটা সত্যি।

কমলাদি ভাবতো ওটা বুড়োবয়সের দোষ।

ফুলের তোড়া কমলাদিকে দিয়ে তাঁর দেওয়া চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হেডমাষ্টার মশাই বললেন 'তাহলে দিদিমনি এবার পুজোয় ভুবনেশ্বর যাওয়ার প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল হোল তো?

'কেন?'

'বারে—বিয়ে যে!'

'সেতো অনেক দেরি। অঘ্রাণে,—ছুটিতো কার্তিক মাসের মাঝ অব্দি।'

'তা বটে। আমি ভাবছিলুম ওদিকটা আমারও দেখা নেই। যদি আপনার সঙ্গে নিয়ে যান সাধটা মেটে। শুনেছি মন্দির স্থাপত্যে ভুবনেশ্বর নাকি অতুলনীয়।' কমলাদির ভাইও এসেছিল এর মধ্যে। শুনে সে বললো 'বেশ তো, আপনিও আসুন না দিদির সঙ্গে। থাওয়ার থাকার অসুবিধে নেই জায়গা তো আমার রয়েছেই। তাছাড়া আমি সারাদিন অফিসে থাকবো আপনি এলে দিদির একা একা বোরিং লাগবে না।' এর পরে কমলাদি না বোলতে পারে নি।

পুজোর বন্ধে কমলাদি আর হেডমাষ্টারমশাই সেবার ভুবনেশ্বরে গেলেন। পথে কিছু কেনা-কাটা করতে দুদিন হেডমাষ্টারমশাইয়ের এক আত্মীয় বাড়ি কোলকাতায় কাটিয়ে গেলেন ওঁরা। ওর একদিন দুজনে একটা সিনেমাও দেখলেন পাশাপাশি বসে।

অঘ্রাণের যে দিনে সানাই বাজবার কথা তার দুদিন আগে কমলাদির কাকা কমলাদির কাছে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিটা এসেছিল পাত্রের বাবার কাছ থেকে। লেখা ছিল,

অঘ্রাণের যে দিনে সানাই বাজবার কথা তার দুদিন আগে কমলাদির কাকা কমলাদির কাছে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিটা এসেছিল পাত্রের বাবার কাছ থেকে। লেখা ছিল,

মহাশয়, আমার পুত্রের বিবাহ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত দিতে পারিলাম না বলিয়া মার্জনা করিবেন। সংবাদ লইয়া জানিলাম আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বভাব চরিত্র বিশেষ সুবিধার নহে। অবশ্য বয়স্থা কন্যাদের বিশ্বাস করাই একটু মুস্কিল। তবে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী, মনে

হয়, রুচি বিকার গ্রস্থা। সে তাহার স্কুলের বিপত্নীক বৃদ্ধ হেডমাষ্টারের সহিত যে ভাবে মেলামেশা করিয়া থাকে তাহা শালীনতা বিরোধী। গত পূজায় তাহারা কয়েকদিন একত্রে কলিকাতায় আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত সারা পূজার ছুটিটা তাহারা উভয়ে বাংলাদেশের বাহিরে স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে একত্রে কাটাইয়াছে। এই সব সংবাদ আমি বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছি। যাহাই হউক আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর এ হেন স্বাধীন আচরণ কুলবধূ হইবার ঘোরতর বিরোধী। অতএব মার্জনা করিবেন। ইতি...........,

চিঠি পড়তে পড়তে কমলাদির কদিনের হাসি হাসি মুখখানা আবার আগের মত অন্ধকার হয়ে গেল। চিঠিখানা নিয়ে চলে এলো ও হেডমাষ্টার মশাইয়ের বাড়ি। কমলাদির চেহারা দেখে উনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি হোল, দিদিমনি?'

কোন কথা বললো না কমলাদি। আস্তে আস্তে শুধু চিঠিখানা এগিয়ে দিল হেডমাষ্টার মশাইয়ের হাতে। চিঠিখানা পড়া শেষ করে যখন হেডমাষ্টারমশাই কমলাদির দিকে চাইলেন দেখলেন টেবিলের ওপর মাথা রেখে দুহাত মুখ ঢেকে বসে আছে কমলাদি। আর কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে কমলাদির পিঠটা। নিজের চেয়ার থেকে উঠলেন হেডমাষ্টার মশাই। আস্তে আস্তে কমলাদির পাশে এসে দাঁড়ালেন। হাতটা রাখলেন কমলাদির পিঠে।

'কমলা—'

কোন সাড়া দিল না কমলাদি।

'তোমাকে কি বলে সান্ত্বনা দেব জানিনা। আর এ ব্যাপারে, সবচেয়ে বেশি দোষ আমার। বড় ছেলেমানুষী করে ফেলেছি' এবার টেবিলে মুখ গুঁজেই কান্নাভরা গলায় কমলাদি বললো 'এখন আমি কি করবো মাষ্টার মশাই, কেমন করে এ মুখ লোকসমাজে দেখাবো আমি?'

খানিক চুপ করে কি যেন ভাবলেন মাষ্টারমশাই। তারপর আস্তে আস্তে বললেন

'জানিনা এবার যা বোলতে যাচ্ছি তা শুনে আমায় কি ভাববে? তবু তুমি যদি রাজি থাকো তোমার সম্মান, বাঁচাতে আমি তোমায় বিয়ে করতেও পারি কমলা ......' হঠাৎ কান্না থামিয়ে মাথা তুলে চেয়ে দেখলো কমলাদি। বিস্ময়ভরা দুটো চোখ নিয়ে দেখলো হেডমাষ্টারের মুখের প্রতিটি রেখার দিকে। কাল নিষ্করুণ হাতে সেখানে তার চলে যাওয়ার সুস্পষ্ট ছাপ এঁকে গিয়েছে। মাষ্টারমশাইয়ের সাদা চুলগুলো, কুঁচকে যাওয়া মুখের চামড়াটা, কাঁচাপাকা দুটো ভ্রূ, দুদিন না কামানো গালে কর্কশ সাদা সাদা দাড়ি, কোটরে বসা নিষ্প্রভ চোখদুটো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো কমলাদি অনেকক্ষণ ধরে।

তারপর চোখের জল মুছে টান হয়ে বসলো কমলাদি। ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির করুণ রেখা ফুটে উঠলো বোধহয়। বললো ......

'সেই ভালো মাষ্টারমশাই সম্মানটাতো বাঁচুক। মেয়েমানুষের সম্মানটাই তো আসল ..."

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

—পাঠিয়েছে? কে? বনবিহারী?

মণিঅর্ডারের কথাটা তখনও বোধহয় কর্তামার কানে যায়নি।

—ওরা সব জানে। বলে লজ্জায় পালাল মৃগনয়ণী। এক সুমধুর লজ্জায় ভরে উঠেছে। এ লজ্জাটুকু দেখাতেও যেন আনন্দে ভরে উঠেছে মন। ছুটতে ছুটতেই প্রায় চলে এল ঘরে। বসে হাঁপাতে লাগল। সব আনন্দের মধ্যেও কোথায় যেন মনের এক অলক্ষ্য কোণে একটা কথা ঘোরাফেরা করতে লাগল। টাকাটা পুজোর। পুজো না দেয়া কি ঠিক হোল? এতে কি ভাল হবে? রাত্রে বারবার মনে মনে মা কালীকে প্রণাম জানাল মৃগনয়ণী।

দশ

সূর্য চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে বললেও বিশ্বাস হোত। তারচেয়েও এক ভয়াবহ খবর এলো সেদিন। তরঙ্গিণীর বরের রাজযক্ষ্মা হয়েছিল। গতকাল সুশীল মারা গেছে। বারো দিন ভুগেছিল।

বিরাট বাড়ীখানা স্তব্ধ হয়ে গেল। বোবা হয়ে গেল। মানুষগুলো একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। কদিনই বা বিয়ে হয়েছিল এর ভেতরি—।

বড্ড অত্যোচার চলছিল। তরঙ্গিণীর সভ্যতা বলে কি একটু কিছুও ছিল গা?

সমালোচনাও চলেছে। অমন জোয়ান সোয়ামী। রাজযক্ষ্মা হয়ে গেল। কি পুরুষখেকো মেয়েমানুষ বাপু!

আহারে! অমন সুন্দর জামাই!

মেয়েটারও কপাল দেখ? এত যার সখ আহ্লাদ! এত যার সাজ-সজ্জে! তার বরাতে এই?

কর্তাবাবুকে খবরটা দিতে সবাইকে বারণ করে দেয়া হোল। কর্তামাই ঠিক করলেন, কাউকে টাকা সঙ্গে দিয়ে পাঠাতে হবে তরঙ্গিণীর শ্বশুরবাড়ী। কে যাবে? কেউ যেতে চাইছে না। বাড়ীর ছেলেরা সব যেন কেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে, আতংকে মুষড়ে পড়েছে। কর্তাবাবুর অসুখ। তরঙ্গিণীর এমন অবস্থা। সংসারে হোল কি? কর্তামা ঠিক করলেন, নায়েব মশায়ের ছেলে সত্য যাবে তরঙ্গিণীকে আনতে। সঙ্গে অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিতে বললেন। কর্তামার আদেশ। নায়েব মশাই স্বীকার করে চলে গেলেন।

কর্তামার কঠিন পাষাণের মত মুখখানার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল মৃগনয়ণী। একটু কাঁদলে না। স্থির কণ্ঠে আদেশ করলেন যা কিছু করবার সেগুলো সুনিপুণ ভাবে করতে। মা কেঁদে কেঁদে মুখখানা ফুলিয়ে ফেললেন। দুদিন জল পর্যন্ত খেলেন না।

কথাটা রামতারণের কানে এলো।

রামতারণ ডেকে পাঠালেন মৃগনয়ণীকে।

মৃগনয়ণীও কাঁদছে। দিদির এমন অবস্থায় চোখের জল আর রাখতে পারছে না। কান্নার

আর একটা কারণ, অবচেতন মনে ওর ভয় বাসা বাঁধছে। তারও যদি এমন অবস্থা হয়? বনবিহারী যদি না বাঁচে? যদি খবর আসে কিছু? দিদির বরের কি চেহারা, হাতের কবজি দুটি কত চওড়া! আর বনবিহারী? হাতদুখানা যেন দুটি সরু পাতলা বাঁশের মত পলকা। কখন বুঝি ভেঙে যায়। চোখ মুছতে মুছতে বাবার কাছে যায় মৃগনয়ণী।

রামতারণ বসেছিলেন একখানি কম্বলের ওপর। শান্ত ঠাণ্ডা চোখদুটি তুলে বললেন,—সুশীল কি মারা গেছে।

মৃগনয়ণীর চোখ বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল আবার নোতুন করে। রামতারণের বলবার আর কিছু ছিল না। একটু সময় চুপ করে বসে রইলেন শুধু, তারপর ধীরে ধীরে একখানি ছোট বই খুলে বসলেন। বইটি সর্বদাই রামতারণের কাছে দেখেছে মৃগনয়ণী। বইটি পড়তে পড়তে মগ্ন হয়ে যান তিনি সময় সময়। এতমগ্ন হয়ে যান যে অনেক সময় ডেকেও সাড়া পাওয়া যায় না। বইটি শ্রীমদ্ভাগবদগীতা।

রামতারণ দেখতে দেখতে বইটির ভেতরে ডুবে গেলেন। মৃগনয়ণী চোখদুটি মুছে চলে এলো। চোখদুটো ওর রাঙা হয়ে উঠেছে। কান্নাটো দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে যেন।

কিযে হচ্ছে সব। একটার পর একটা অঘটন। পরিষ্কার দেখতে পায় ও রূপসী চঞ্চলা তরঙ্গিণীর খঞ্জনের নাচুনে চোখদুটো। সেই তরঙ্গিণীর কি রূপ দেখবে! ভাবতেই মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে।

দিনদুয়েকের ভেতরই সত্য নিয়ে এলো তরঙ্গিণীকে। ভেতর বাড়ীর যে ঘরে কর্তাবাবু থাকেন, সে ঘর থেকে অনেকটা দূরে, অনেকটা উত্তরে একখানা ছোটঘরে তরঙ্গিণীকে রাখা স্থির হোল। ব্যবস্থা করলেন কর্তামা। বারণ করা হোল সবাইকে কেউ যেন চাঁৎকার করে না কাঁদে। মাকেও বুঝিয়ে বললেন খুড়ীমা। মা চুপ করে যেমন পড়েছিলেন, তেমনি পড়ে রইলেন।

তরঙ্গিণী এলো। এসেছে। এসেছে তরঙ্গিণী। ফিস ফিস চাপা আওয়াজে ভরে গেল বাড়ীখানা। এসেছে।

পুঁটির কাছে বসে চুল বাঁধছিল মৃগনয়ণী। শুনে লাফিয়ে উঠল—পুঁটিদি চ'। পুঁটি উঠেই আবার বসে পড়ল—মাথার ভেতরটা কেমন করছেরে। এক গেলাস জল দিবি?

—তুই তবে শুয়ে পড়। আমি আসছি।

পুঁটি নিজেই উঠে এক গেলাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। হাঁটবার একটুও শক্তি নেই ওর পায়ে। পাদুটো যেন অবশ হয়ে গেছে। মৃগনয়ণী ততক্ষণে বাইরে চলে এসেছে। অনেকেই এসেছে। সত্য দাঁড়িয়ে আছে। তরঙ্গিণীকে ধরে পাল্কী থেকে বার করা হোল। কালো একরাশ চুল কেটে ফেলেনি তার? আগোছাল চুলের ভেতর দিদির মুখখানা দেখতে পাচ্ছে মৃগনয়ণী। সেই মুখ। সেই চোখ। চোখের কোলে নীলাভ ছায়া। পাণ্ডুর বিশুষ্ক ঠোঁটদুটি কাঁপছে কি? তরঙ্গিণী কাউকে জড়িয়েও ধরল না। চীৎকার করে কেঁদেও উঠল না। বৈধব্যকে ও যেন ঠিকমত স্বীকার করে নিতে পারেনি আর সব মেয়ের মত। শুধু ক্লান্তি আর দিনগুলোর একঘেঁয়েমীতে যেন একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তরঙ্গিণী মুখটা নীচু করে বাড়ীর ভেতরের দিকে এগোয়।

এত শোকাবহ হাওয়ার ভেতরেও লক্ষ্য করল মৃগনয়নী দিদির রূপ যেন আরও বেশী করে চোখে পড়ে। শুভ্র বসনা হয়ে ও যেন আরও অসামান্য হয়ে উঠেছে।

চোখের নীলাভ ছায়া মুখের শ্রান্তি ওকে যেন করুণতায় আরও মধুময়ী করে তুলেছে। আহারে! এই রূপ! এই যৌবন! ব্যর্থ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিলে তিলে এ-যৌবনের সমাধি হয়ে যাবে।

এতক্ষণে আবার কাঁদতে পারে মৃগনয়নী।

তরঙ্গিণীর হাত ধরে এসে। তরঙ্গিণী তাকায়। কথা বলে না।

মৃগনয়নী ওর হাত ধরতেই সবাই যেন বেঁচে যায়। মৃগনয়নীই নিয়ে যাক ওকে ওর ঘরে। এখন আর কারো সঙ্গে দেখা না করাই ভাল। ঘরে এসে দেখে পুঁটি শুয়ে আছে। এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল, তরঙ্গিণীকে আসতে দেখেই চোখ দুটো বুজে ফেলে। ও দেখতে পারবে না। কি করে ও তাকাবে দিদির দিকে। জল তেষ্টায় গলাটা আবার কাঠ হয়ে উঠেছে।

তরঙ্গিণী আর মৃগনয়নী এলো ঘরে।

— অ পুঁটিদি, ওঠ না!

পুঁটি পিট্ পিট্ করে তাকায়। তরঙ্গিণী চৌকীর ওপর বসে। বাইরে লোকের সামনে এতক্ষণ যে গাম্ভীর্য ওর দেখেছিল, সেটা একটু সহজ হয়ে আসে। ঘরে পুঁটি আর মৃগনয়নী।

তরঙ্গিণী বলে,—মা কই রে?

মৃগনয়নী উত্তর দেয়,—মায়ের ঘরে। দুদিন ত জলস্পর্শ করেনি। কি যে অবস্থা। একটা বড় নিশ্বাস ফেলে তরঙ্গিণী।— তুই কবে এলি?

—আমি?—একটা ঢোক গিলে বলে মৃগনয়নী।—তা প্রায় পাঁচ ছমাস হোল। এসেই ত বিপদের ওপর বিপদ। কর্তাবাবু একেবারে শয্যাশায়ী।

—কি হোল তাঁর?

পুঁটি এতক্ষণে উঠে বসেছে।

বলে,— কর্তাবাবু ত' মরো মরো। এই যায় এই যায়!

তরঙ্গিণী অবাক হয় একটু। ও খবরটা জানত না'

—পুঁটি বুঝি সেই থেকেই আছিস?

পুঁটি মুখটা নীচু করে বলে,—হ্যাঁ।

—আমায় একখানা কাপড় দেনা ভাই। কাপড়টা ছেড়ে নি।

—কাপড়! — বলেই মৃগনয়নীর মনে পড়ে সাড়ী দিলে ত' পড়তে পারবে না। শাড়ী পরা জন্মের মত ঘুচে গেছে। চোখদুটো ছলছল করে ওঠে ওর।

তরঙ্গিণী আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,— বাবার একখানা কাপড় নিয়ে আয়।

মৃগনয়নী ভেবে উঠতে পারছিল না কোন কাপড় দেবে। দিদির কথায় ও যেন বেঁচে যায়। ছুটে যায় মায়ের ঘরের দিকে। দেখে মায়ের ঘরে সত্য বসে আছে আর কর্তামা। মৃগনয়নী যেতেই ওরা চুপ করে যায়। সত্য একটা তোরঙ্গের ওপর বসেছিল। সরে বসে।

কর্তামা বলেন,— ওরা এমন ব্যাভার করলে?

সত্য একবার মৃগনয়নীর দিকে তাকিয়ে বললে,— তাই ত' দেখলামই যখন চলে আসি, কেউ ত' একবার গাড়ীতে তুলে দিতেও এলো না। তাদের ধারণা সুশীলবাবু মরেছে বৌয়ের দোষে। দুদিন নাকি ওকে কেউ ছোঁয় নি। মৃগনয়নীর বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। এ অবস্থার পরেও এত অবহেলা পেয়ে এসেছে! মা কেঁদে ওঠেন আবার।

—কেঁদোনা নবৌ। — কর্তামা বলেন।

মৃগনয়নী বাবার একখানা ধুতি বগলে করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। নিজের ঘরে এসে দেখে তরঙ্গিণী পা দুখানা মুড়ে বসেছে চৌকীর ওপর। আগে যেমন বসত। পুঁটি খুব কথা বলে চলেছে। এতক্ষণে বোধহয় ভয় ভেঙেছে পুঁটির।

—তারপর?— তরঙ্গিণী জিজ্ঞেস করছে।

পুঁটি বলে চলেছে, — তারপর ভয়ে মরি! রাধা তোর কোন দোষ নেই বলে বিড় বিড় করে বকে চলেছে কর্তাবাবু। আমায় আবার জেনে বলে দ্যাখত দোরের কাছে কেউ দাঁড়িয়ে কিনা। ভয়ে আমার হাত পা এখন কাঁপছে। তরঙ্গিনী অবাক হয়ে শোনে।

—নে দিদি, কাপড়টা ছেড়ে নে।

তরঙ্গিনী কাপড়টা নেয় মৃগনয়নীর হাত থেকে। পুঁটির পাশে গিয়ে বসে মৃগনয়নী। তরঙ্গিনী কাপড় বদলাচ্ছে।

পুঁটি জিজ্ঞেস করে,— দিদি কোথায় থাকবে রে?

—বোধহয় উত্তরের ঘরে।

—আর কে থাকবে?

—জানি না ত'!

—দিদি তারচেয়ে এ ঘরেই থাকনা। তিনজন শোব।— বলে পুঁটি।

মৃগনয়নীর বিধবার কাছে শুতে ভাল লাগে না। হোলই বা দিদি। সদ্য সদ্য বিধবা হয়েছে। যদি ছোঁয়া লেগে তার আবার কিছু —।

তরঙ্গিণী বুকের ওপর আঁচল তুলে বলে,— আমি একাই শোব। উত্তরের ঘরেই শোব।

—একা কেন? বোধহয় মা থাকবে তোমার কাছে। — বলে মৃগনয়নী।

মৃগনয়নী আবার চৌকীর ওপর বসে। হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় তরঙ্গিণী। মুখটা নীচু করে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

পুঁটি একটু উস্‌খুস্‌ করে। এই নীরব ভাবটা ওর ভাল লাগে না। তবু কথা বলতে পারে না একটিও। মৃগনয়নী তরঙ্গিণীর দিকে যত তাকায় ততই ভয় হয় ওর।

তরঙ্গিণী মুখটা তুলে বলে,—হ্যাঁরে। বাবার সরু পাড়ওলা কাপড় পরেছি। কর্তামা কিছু বলবে নাত?

মৃগনয়নী হতবাক হয়ে যায়। একথার কি উত্তর দেবে ও। চোখদুটো ওর ছলছলিয়ে ওঠে। তরঙ্গিণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখটা নীচু করে ফেলে। ফর্সা হাতখানা কোলের ওপর পাতা। তার ওপর টপ্‌ টপ্‌ করে কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়ে। পুঁটি আস্তে আস্তে উঠে পালায়। ও কান্না সহ্য করতে পারে না। বুকের ভেতরটা কেমন করে কারো কান্না দেখলে। মৃগনয়নীর গলা বন্ধ হয়ে এসেছে।

তবু গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে — জামাইবাবুর কি হয়েছিলরে?

—যক্ষ্মা।— সামলে নিয়েছে তরঙ্গিণী। মুখ তুলে তাকায়। একটু যেন ম্লান হাসে।

—অমন স্বাস্থ্য!

—ডাক্তার বললে চেহারা খুব ভাল হলে তাদের রোগটা মারাত্মক হয়।

—আর রোগাদের?

—রোগাদের হলেও টিঁকতে পারে।

—তুই কি পাশে বসেছিলি শেষ সময়।

—না। — তরঙ্গিনী আবার মুখটা নীচু করে।

—কেন? — অবাক হয়েছে মৃগনয়নী।

—থাকতে দেয়নি। — গলাটা বেশ ভারি ঠেকছে তরঙ্গিনীর।

—কেন রে?

—জানি না।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

আবার বলে,— তুই কেন জোর করে গেলি না!

চোখদুটো জলে ভরলেও মুখের ম্লান হাসির রেখা মিলোয় না তরঙ্গিনীর। জবাবে বলে,— আমার দেওরকে জানিস না ত'। জোর করলে হয়ত বেঁধেই রাখত।

মৃগনয়নীর চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে যায়।

তরঙ্গিনী বলে,— তোর বর কই?

—কলকাতায়।

—কেন?

—চাকরী করছে।

তরঙ্গিনী শুধু হুঁ — বলে চুপ করে থাকে।

একটু পরে বলে,— আর পুঁটির?

—দেশে।

—ভাল আছে?

মৃগনয়নী কথাটা আর চাপতে পারে না। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে,— যেন বলিস নি কাউকে! ওর বর ওকে নেয় না। ও ত' সেই থেকে এখানে। একটু অহঙ্কার প্রকাশ পায় মৃগনয়নীর কণ্ঠে। এটা যে খুব ঠিক হোল না। নিজেই যেন পরমুহূর্তে বুঝতে পারে। তরঙ্গিনী চুপ করেই বসে থাকে।

দিনকতক কাটবার পরই তরঙ্গিনী একটু হালকা হয়ে এলো। এক আধ সময় নিজেরই অজ্ঞাতে হেসেও ফেলত। মৃগনয়নী আজ দুপুর থেকে বড়ই মুষড়ে পড়েছে। কলকাতায় যে গিয়েছিল তার কাছ থেকে খবর পেয়েছে — বড়ই খারাপ খবর। খবরের প্রয়োজন ছিল না। টাকা ত' এসেছিলই।

তবু হৃদয়দা এসে গায়ে পড়া হয়ে বললে,— একটা খবর বলা হয়নি তোমায়?

হৃদয় তার আঙ্গুলকাটা হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলে।—এ্যাদ্দিন ভেবেছিলুম বলব না। আজ দেখছি বলাই ভাল।

—কি বলো না?

—কবরেজ মশায়ের ভাগ্নেকেও পাঁচকান করতে বারণ করে দিইছি। আমিও কাউকে বলব না। তুমিও কাউকে বোল না।

—খবরটা কি?

—বললে, কলকাতায় একতলা বাসায় ও যখন গেল তখন জামাই নাকি নেশায় ছিল। ওর দাদা এসে কবরেজ মশায়ের ভাগ্নেকে আপ্যায়িত করেছিল।

—নেশা? কি নেশা? — স্তম্ভিত হয়ে গেছে মৃগনয়নী।

হৃদয় মুখটা নীচু করে বললে,— কিছু নয়। একটু আধটু মদ-টদ বোধহয় খাচ্ছে।

মদ! মদ খাওয়া ধরেছে বনবিহারী?

হৃদয় চলে গেছে। মৃগনয়নী সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। বনবিহারী মদ খাচ্ছে! শুধু মদ হলেও সান্ত্বনা ছিল! মদ হলেই তার সঙ্গে মেয়ে এসে জুটবেই একথা ত' মৃগনয়নীর অজানা। তার কর্তাবাবুকে দেখেছে। তার কাকাকেও একআধ সময় দেখেছে। তাদের বাড়ীতে এমন ঘটনা ত' ঘটেছে। শেষকালে এই হোল! যেটুকু অহঙ্কার ওর মনে এসেছিল, সেটুকু নির্মূল

হতে চলেছে। ভেবেছিল পুঁটিদি, দিদি ওদের চেয়ে তার বরাত কত ভাল! অবচেতন মনের কোথায় যেন এই অহঙ্কারের ধোঁয়া জমে উঠেছিল। এ খবর সে ধোঁয়াকে ঝড়ের মুখে উড়িয়ে নিলে। হয়ত ভালই হোল। কিন্তু মৃগনয়নী হারতে জানে না। তাকে কলকাতায় যেতে হবে। যত শীঘ্র পারে যেতে হবে। এখন যাওয়া যে কিছুতেই সম্ভব নয়। ও যে সন্তান-সম্ভবা। তবু এখন থেকেই চেষ্টা করতে হবে। যাবার চেষ্টা করতে করতে যতদিনে যাওয়া যায়। পরের দিন চিঠি লিখল বনবিহারীকে। চিঠিটা বড় বড় হরপে প্রায় দুপাতা হয়ে গেল। ও সব কথা নয়। শুধু যাবার কথা। সব প্রস্তুত রেখো। আর মাসখানেকের ভেতর কিছু হলেই আঁতুর তুলে আমি যাব। না গেলে আর থাকতে পারছিনা। শুধু যাওয়ার কথা। কিন্তু কথা কথাই। মন নয়।

এগারো

একটি ছেলে হয়েছে মৃগনয়নীর। আঁতুড়ে তরঙ্গিণীই রাত জাগল। বাড়ীর উঠোনের একটা কোণে চালা তুলে দেওয়া হোল। সেটাই হোল আঁতুড় ঘর। একটুখানি একটা প্রাণ ধুক্-ধুক্ করছে। তাকিয়ে দেখে মৃগনয়নী। বেশ বড়-সড় হয়েছে ছেলেটি। দেখতে মৃগনয়নীর মতই। কালো রঙ, কালো চুল মাথা ভর্তি, কালো চোখদুটি বড় বড়। বনবিহারীর মত পিঙ্গল চোখ, ফরসা রঙ নয়। ভালই হয়েছে। ওঁর মত হলে হয়ত রোগাও হোত। অসুস্থ হোত। মৃগনয়নী খুব খুসী। এ অবস্থায় বেশী নড়ে শোবার বসবার হুকুম নেই।

তরঙ্গিনীকে বলে,— একটু এদিকে দে না দিদি!

—কাকে?

আঙুল দিয়ে ছেলেকে দেখায় মৃগনয়নী।

তরঙ্গিণী একটু হেসে ওর কাছে শুইয়ে দেয় ছেলেকে।

হাতের ওপর টেনে নেয় ছেলেকে। তাকিয়ে থাকে। দেখতে বেশ লাগে। অনেকক্ষণ দেখেও যেন দেখবার আকাঙ্খা মেটে না। বুকের কাছে টেনে নেয়। হঠাৎ মনে হয় কালোবৌ সরলার কথা। তোর ছেলে হোক মেয়ে হোক আমায় দিবি? কথা দিয়েছে ও দেবে। কালো বৌকে দেবে। এই ছেলেকে কালো বৌকে দিতে হবে। কথা দিয়েছে। কেন কথা দিল? তখন কি একটু ভাবতে পেরেছিল যে এমন সুন্দর হবে ছেলেটা! কথা না দিলেই হোত তখন। যদি কলকাতায় যাবার পর দেখে কালো বৌ এসেছে। যদি তখন চেয়ে বসে ছেলেকে? বুকের কাছে আরও টেনে নেয় ছেলেটাকে। মুখটা ওর শুকিয়ে যায়।

হৃদয়দা' এক গামলা গরম জল এনে দিয়ে যায় ঘরের সামনে।

তরঙ্গিনী বলে,—নে, ওঠ। ছেলেকে আমার কাছে দিয়ে কাপড় ছেড়ে নে।

—থাক না এখন।— মৃগনয়নী উঠতে চায়। এই মুহূর্তে ছেলেকে ছাড়তে চায় না।

তরঙ্গিনী ধমকায়।— সবই তোর আদিখ্যেতা। জল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে! উঠে পড়।

—একটু দুধ খেয়ে নিক।

—পরে খাবে।— বলে তরঙ্গিনী ওর বুকের কাছ থেকে ছেলেকে তুলে নেয়।

অগত্যা উঠতে হয় মৃগনয়নীকে, কিন্তু তরঙ্গিনীর ভাবটা যেন ভাল লাগে না।

রাত্রেও তরঙ্গিনী ছেলেকে কোলে করে নিয়ে মধু চোষায়। নিজের কোলে রাখে। তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে একদৃষ্টে। কি যেন ভাবে অন্যমনস্ক হয়ে। মৃগনয়নীকে তার আগেই বলে।— চোখ বোঁজ। ঘুমো। ঘুম না হলে শরীর সারবে না।

দিদির কথায় চোখ বোঁজে মৃগনয়নী। কিন্তু ঘুম ওর আসে না। পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে দেখে তরঙ্গিনী তাকিয়ে ছেলের মুখের দিকে ছেলেকে কোলে নিয়ে। কিছু বলতে সাহস হয় না। কি ভাববে আবার। একএকবার মনে ভাবে দিদি যদি চেয়ে বসে—দেনা তোর ছেলেটাকে, আমি পালব। সদ্য বিধবা দিদিকে ও কি বলে বিমুখ করবে? মৃগনয়নী ভয় পায়। মিছিমিছি ভয় পায়। তরঙ্গিনী ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল একেবারে অন্য কথা। তারও একটা ছেলে ত' হতে পারত! তাও হোল না। এ যৌবনের অসহনীয় ভার নিয়ে একা একা সে কি করে কাটাবে? একটা সন্তানের কামনাও কি তার থাকতে নেই আর? একটি পুরুষের আকস্মিক মৃত্যু দিয়ে তার ভবিষ্যত জীবনকে এত নিষ্ঠুর ভাবে বিচার করা হবে। সে জীবনের যৌবনের আর কোন সুযোগ পাবে না। কেন পাবে না? তার পিনোন্নত পয়োধর, তার যৌবন-রসসিঞ্চিত নিতম্বের ভার। এ সে কেমন করে বইবে। সে কি পাগল হয়ে যাবে না?

চোখদুটো জ্বলছে তরঙ্গিনীর। ছেলেটার দিকে তাকিয়েই রয়েছে।

জোর করে তার ওপর যে আজীবন কঠোর সংযমের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হোল। একে রক্ষণ করবার সামর্থ তার থাকবে কিনা কে জানে! মনের স্ফুরিত যৌবন জ্বালা বিকৃত হয়ে উঠছে দিনদিন। বেশ বুঝতে পাচ্ছে তরঙ্গিনী ও কিছুতেই এ ভাবে চলতে পারবে না। সব মিথ্যা হয়ে যাবে। সব মিথ্যা। মানুষগুলো সব মিথ্যে মুখোস পরে রয়েছে। এক অকারণ ঘৃণা আর ক্রোধে ফুলে ওঠে তরঙ্গিনী।

—কি হোলরে দিদি। বিড় বিড় করে কি বলছিস? — মৃগনয়নী ভয় পেয়ে বলে ফেলে।

—কিছু নয়ত। — তরঙ্গিনীর চিন্তার গতি সংহত হয়। বলে, — তুই ঘুমো।

মৃগনয়নী অগত্যা আবার চোখ বোঁজে। দিদির ভাবগতিক ওর একেবারেই ভাল লাগে না।

এমনি দিনকটা কেটে গেল। আরও কিছুদিন কাটতে চলল। কলকাতা থেকে চিঠির উত্তর নেই। কোন সাড়াশব্দ নেই। এক অস্বস্তি আর অশান্তি এসে বাসা বেঁধেছে মৃগনয়নীর মনে। বনবিহারী মদ খায়। মাতাল হয় আজকাল। সংবাদটা পাবার পর থেকে অস্বস্তি ওর বেড়েই চলেছে। নিজেকে শান্ত করবার কোন সান্ত্বনাও যেন খুঁজে পাচ্ছে না আজ। খেতে বসে বার বার মনে হয় বনবিহারী কি খাচ্ছে কে জানে। মদ খাচ্ছে হয়ত এখন। তারপর কি বাড়ী ফিরে আসবে? না আসতেও পারে হয়ত কোথাও গেছে। অন্য কোথাও। অন্য কোন মেয়েমানুষের বাড়ী। সেখানে বনবিহারী গিয়ে কি করতে পারে। হয়ত আরও মদ খাবে। নাঃ। আর ভাবতে পারছে না। হাত ঝেড়ে উঠে পড়ে মৃগনয়নী। ছেলে কোঁদে উঠবে এখুনী।

পুঁটি বলে,— কি হোল রে?

—যাই ছেলে বোধহয় কাঁদছে। — বলে বেরিয়ে পড়ে মৃগনয়নী।

অন্ধকার রাত। দয়াময়ী কালী বাড়ীতে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে এত রাত্রে। আজ বোধহয় তবে অমাবস্যা। কি ভীষণ অন্ধকার। একটা লোকজনের সাড়াও নেই এদিকটায়। উত্তর দিকে হন্ হন্ করে এগিয়ে আসে মৃগনয়নী। আজ আর ঘাটে যাবে না। ইঁদারার পাড়েই আঁচিয়ে নেবে। এঁটো হাতে এগোতে এগোতে হঠাৎ ওর নজরে পড়ে একটা মানুষ ঢুকল তরঙ্গিনীর ঘরে। তরঙ্গিনীর ঘরটা ইঁদারার একটু তফাতে। ঘাটের দিকে একেবারে উত্তরে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মৃগনয়নী। তরঙ্গিণী রাত্রে একটু ফল মিষ্টি খেয়ে শুয়ে পড়েছে। সঙ্গে শোয় সনকা ঝি। সনকা ঝি অবশ্য এখনও থাওয়া মিটিয়ে ঘরে আসেনি।

কে ঢুকল ঘরে।

আস্তে আস্তে ঘরের কাছাকাছি এগোল মৃগনয়নী। ভয় ভয় করছে। তবু এগোল। কথা কানে আসছে। দিদির গলা। আরও কাছে এগোয় ও। ঘরের পিছনের দিকটায় দাঁড়িয়ে কান পাতে। নিজের বুকের শব্দ ও নিজেই শুনতে পারছে। ভয়ও করছে। কিন্তু এ কৌতূহলকে নিবৃত্ত করবার শক্তি নেই ওর।

—কেন বারে বারে ডেকে পাঠান?— লোকটার গলা। গলাটাও যেন চেনা চেনা।

—কেন তা' কি আজও বুঝিয়ে বলতে হবে? ছোটবেলা বর-বৌ খেলতাম আমরা মনে আছে। এ যে দিদির গলা।

এ যে দিদির গলা।

—আপনি কি চান? — গলাটা বেশ চেনা।

তরঙ্গিনীর হাসির শব্দ শুনতে পায়।

—এখুনী ত' ঝি এসে পড়বে।

—পড়ুক। ওর হাত দিয়েই ত' চিঠি পাও।

—কিন্তু আমার বড় ভয় করছে। আপনি সর্বনেশে কিছু করবেন না।

—ছিঃ! তুমি পুরুষ মানুষ সত্য। তোমার মুখে এসব কথা সাজেনা।

সত্য। নায়েব মশায়ের ছেলে সত্য! সত্যই ত' দিদিকে শ্বশুরবাড়ী থেকে আনতে গিয়েছিল। মৃগনয়নীর বুকের শব্দ বন্ধ হবার উপক্রম।

—আমার দিকে তাকাও সত্য। দ্যাখ।

মৃগনয়নীর হাত পা ঘেমে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এ সব কি শুনছে ও। স্বপ্ন দেখছে নাত'? এ কি সত্য হতে পারে? মাত্র কয়েকমাস আগে জামাইবাবু মারা গেছেন এর ভেতরে সব ভুলে গেল দিদি? এই ভালবাসা? দিদির প্রাণে কি একবিন্দু ভালবাসাও ছিল না জামাইবাবুর জন্যে?

মৃগনয়নীর বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। কানে শুনেও অনেক কথা অবিশ্বাস্য মনে হয়, এ তাই।

—আপনার দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এমন রূপ আপনার অথচ এমন মন! আশ্চর্য!

—মন আমার বশে নেই সত্য।

—কেন?

—আমার মনে একটা জ্বালা আমাকে এমন করে তোলে। এ যে কিসের জ্বালা জানিনে। বিশ্বাস করো সত্য, আমি চেষ্টা করেও মনকে বশে আনতে পারিনি।

দিদির মুখে এমন কথা! এবার অবাক হতে হয়। দিদিও তাহলে নিজের মনের দিকে মাঝে মাঝে তাকায়। মনকে দেখবার চেষ্টা করে। তবে কেন দেখেনা তার উগ্রকামনার রূপকে। দেখে। আর দেখে বলেই জ্বলে। জীবনের এ সত্য মৃগনয়নী অনেকবার টের পেয়েছে যে মনকে চোখে চোখে রাখা বড়ই কঠিন। অনেক বছর কাটিয়ে জীবনের পর্যায়ে এসে ওর স্থির ধারণা হয়েছিল, মনের স্বভাব পাঁচ বছরের ছেলের মত। চঞ্চল, অবুঝ। বোঝালে বেঁকে বসে। না বোঝাতেই হয়ত' ঠাণ্ডা হয়। ওকে চোখে চোখে না রাখলে জীবনের অনেক সম্পদকে ভেঙে তছনছ করে দেবে।

(ক্রমশঃ)

তবে বল

সঞ্জয় মজুমদার

বুঝিনা কেন তুমি রজনী ঢাকো শুধু অলখ আঁচলে
কেন যে নির্বাক প্রহর কেটে যায় ফাগুন-প্লাবনে :
কেন যে ধূলিরেণু জমেছে থরে থরে মুখের আদলে
হাসনা ঝিকিমিকি কাঁদনা ছলোছলো অযথা কারণে।
কুয়াশা নামে রাত গভীরতর হলে বাঁকানো সড়কে
তোমারও মনে বুঝি; নতুবা কেন বল রজনী পেতনা
তোমারি ছোঁয়া সুখ। অথচ জাননা কি প্রতিটি পলকে
আমি যে একমনে কুড়িয়ে রাখি তবু ঝিনুক-চেতনা?

কখনো আমি যদি হৃদয় ছিঁড়ে ফেলি নিঠুর আঙুলে,
মনের ঝাঁপি খুলে কেবলি তুলে ধরি বেদনা বেদনা,
সকালে রোদে ভিজে চরণে দলে যাই বিকচ পারুলে?
তবে কি পার তুমি নীরবে চোখ তুলে তাকাতে বিমনা,
পারকি কুণ্ঠিত চুলের কালো মেঘে বিজলী হাসাতে
এবং প্রতি পলে প্রেমের খরটানে আমাকে ভাসাতে?

জোয়ার

সন্তোষকুমার অধিকারী

পৌর্ণমাসী আকাশ হ'তে দিয়েছে ডাক
সে তার
উতল বুকে কি ফুলিছে ঢেউ আশায়,
তটের বুকে শুনছে কী সে ভাষায়?
ফুলিছে মন কী আশ্বাসে, ছুটেছে যেন হাওয়ার পিছে
সোয়ার;
সমুদ্রে কি বন্ধহারা উচ্ছ্বসিত হৃদয়...
এলো জোয়ার?

শুন্‌বেনা সে নিষেধ কারো শুন্‌বেনা।
ভীরু আশায় হতাশ্বাসে গুন্‌বেনা দিন ভবিষ্যতের
গুন্‌বেনা।
ভাঙ্‌বে চির পেছনটানা বাধায়; বেড়া ভাঙ্‌গায়
মন যেন ওই আকাশ প্রেমে ইচ্ছেটাকে রাঙ্‌গায়;
ঢেউয়ের ফেণা উদ্বেলিত মাতাল মনে ভাঙ্‌ছে শুধু
খোয়ার,
এলো জোয়ার?
ডাক্‌ এসেছে আকাশ হ'তে, এসেছে ডাক তীরে,
এবার শুধু প্রতীক্ষাতুর ক্ষণকে যাওয়া ছিঁড়ে,
বুকের ভাষা গুণ্‌ছিল যার চরণ,
এবার তারে অবাধে দাও বরণ,
বজ্রকরে দুঃখবহ মেঘের মত হাওয়ার পিঠে
সোয়ার,
হবেই যে সে, শুন্‌বেনা আর বাধানিষেধ
এলো কী এ' জোয়ার?

আণবিক অস্ত্র ও বিশ্বসংকট

আমরা আজ এমন একটি যুগের সীমানায় এসে পৌছিয়েছি যেখানে একদিকে দুলছে ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা, আরেকদিকে ঘনিয়ে আসছে অকালমৃত্যুর কালছায়া। একদিকে প্রতীক্ষা করছে নবযুগের শুভ উদ্বোধন, তার রক্তিম আলো দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে, আরেকদিকে চলেছে বিশ্বসভ্যতার চির-অবসানের ঘৃণ্য কুটিল ষড়যন্ত্র। এই দুই-এর মাঝখানে পথ চিরে চলেছে বর্তমান পৃথিবীর ইতিহাসধারা।

আণবিক শক্তির আবিষ্কারের পর আজ যন্ত্রজগতের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভবপর হয়েছে। বৈদ্যুতিক শক্তির থেকে আণবিক শক্তি প্রায় হাজারগুণ বেশী কার্যকরী। এই বিপুল শক্তিসম্ভারকে কলকারখানা, শিল্পঅগ্রগতির পথে যদি নিয়মিত নিযোজিত করা যায় তবে অনাগতভবিষ্যতে আশা করা যায় মানুষ স্বর্ণযুগে বাস করবে। এই আণবিক শক্তির বলে প্রকৃতির শাসনের সীমাকে অতিক্রম করে প্রকৃতি দেবীকে আমরা মানুষের জীবনলীলা সহচরী করে তুলবো। এই স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনাকে আজ পৃথিবীর দুইপ্রান্তে যুদ্ধ-কামী এমেরিকা ও সোভিয়েত শক্তিপুঞ্জ আণবিক অস্ত্রের সংঘাতে সমূলে ধ্বংশ করতে চলেছে, তৃতীয় মহাযুদ্ধে যদি এই দুই যুদ্ধশিবির আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে তার পরিণাম শুধুমাত্র রণক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে না সেই আগুনের লেলিহান অগ্নিকণা ছড়িয়ে যাবে সারা পৃথিবীর বুকে। আগামী দিনে এই অভিশপ্ত পৃথিবীকে যদি পুনরায় যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় তবে সেই যুদ্ধের ফলে কয়েকটি নগরী ধূলিসাৎ ও হাজার হাজার সৈন্যের আত্মাবলিতে সেই ধ্বংসের আগুন নির্বাপিত হবেনা, বৈজ্ঞানিকমহলের দৃঢ় অভিমত যে আণবিক অস্ত্রের যে ভবিষ্যতের কোন যুদ্ধে যদি হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করা হয় তবে তার ফলে অচিরে পৃথিবীর অগণিত নরনারী একচিতাগ্নিতে সহমরণ করবে। যে অল্পকয়েকজন অভাগার বিষ্ফোরণের সাথে সাথে মৃত্যুকে বরণ করার সৌভাগ্য হবেনা তাদের অপরিসীম দুঃবেদনার আগুনে ধীরে ধীরে মৃত্যু-যন্ত্রণা সইতে হবে। স্যার জন স্লেশার বিমানযুদ্ধে একজন অভিজ্ঞ নায়ক। তিনি বলছেন "বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধ সর্বজনীন আত্মহত্যার সামিল। এর ধ্বংশের তাণ্ডবলীলা থেকে কেহ নিস্তার পাবেনা।" তিনি আরও বলছেন "আজ আমরা এমন একটা সমস্যার সম্মুখে এসে পড়েছি যে একটি বিশেষ অস্ত্রকে বিসর্জন করা থেকে সমগ্র যুদ্ধ প্রস্তাব ও তার প্রস্তুতিকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করার পথে এগিয়ে যেতে হবে।"—একই সুরে সুর দিয়ে এয়ার চীফ্ মার্শাল স্যার ফিলিপ জোবার্ট বলছেন "হাইড্রোজেন বোমার আবির্ভাবের পর সমগ্র মানবজাতি এমন এক সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে যে আজ হয় তাদের পররাজ্য হরণ ও যুদ্ধ অভিসন্ধি চিরতরে বাতিল করতে হবে না হয় এই পৃথিবীর সমগ্র ধ্বংশের জন্য মানুষকে তৈরী থাকতে হবে।" আজ আমাদের সমস্যা বিশেষরাজ্যের পররাষ্ট্রনীতি বা সামরিক গরম বা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রশ্ন নয়। সবার সম্মুখে এই প্রশ্ন বিরাট ভাবে দেখা দিয়েছে যে এই লড়াই-এর

ফলে শুধুমাত্র বিশ্বসভ্যতার ওপর চরম আঘাত আসবে না এর সাথে সাথে এই পৃথিবীর বুক থেকে মানুষ জাতি হবে নিশ্চিহ্ন।

শারীরিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ বিশারদ লর্ড এ্যাডিয়ান সম্প্রতি ব্রিটিশ এসোসিয়েশন-এর সভাপতির ভাষণে বলেছেন যে আণবিক বিস্ফোরণের ফলে ধীরে ধীরে সমগ্র মানুষজাতির হবে চিরবিলুপ্তি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষপ্রান্তে হিরোসিমা ও নাগাশাকি যেদিন আণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংশের আগুনে জ্বলে উঠল সেদিন সারা পৃথিবীর লোক এই ভীষণ মারনাস্ত্রের বিষক্রিয়া দেখে স্তম্ভিত হয়েছিল। এরপরে অস্ত্রের প্রতিযোগিতাতে ক্রমেক্রমে এসেছে হাইড্রোজেন ও কোবাল্ট বোমা। অস্ত্রবিশারদের মহল থেকে শোনা গেছে যে আণবিক বোমার ফলে হিরোসিমা ও নাগাশাকি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে তার থেকে ২৫,০০০ বার শক্তিশালী হোল এই হাইড্রোজেন বোমা। এই থেকে সহজে অনুমান করা যায় হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংশের পরিধি কতদূর বিস্তৃত হবে! একটি আণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে যদি হিরোসিমা ধূলিসাৎ হয় তবে হাইড্রোজেন বোমার শক্তি অনুমায়ী তার একটি লণ্ডন, নিউইয়র্ক বা মস্কোর মতো বিরাট সহরকে নিমেষে অবলুপ্ত করতে পারে। এই মারণাস্ত্রের ধ্বংসের লীলা এইখানেই শেষ হবেনা। হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের ফলে সক্রিয় রেডিও তাড়িত কণা বায়ুমণ্ডলীতে ছড়িয়ে যাবে। এই সব কণা ধীরে ধীরে বৃষ্টি বা বিষাক্ত ভস্ম বা ধূলিতে রূপান্তরিত হয়ে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়বে। এই আণবিক ভস্মের সংস্পর্শে এসে কিছুদিন পূর্বে জাপানী জেলেদের দুরারোগ্য রোগের কবলে পরতে হয়েছিল।

হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের ফলে যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে তাহা ধারণার অতীত। সবদেশের বৈজ্ঞানিকরা এই বিষয়ে একমত সক্রিয় রেডিও তরঙ্গ সহকারে এক মহাঅস্বস্তিকর আবহাওয়া সৃষ্টি হবে। এর বিষক্রিয়া বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে শরীরের বিভিন্নস্থানে। শরীরের জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে হবে স্তিমিত, ক্রমেক্রমে এই পৃথিবীর বুক থেকে মানুষজাতি হবে নিশ্চিহ্ন।

এই ভয়াবহ হাইড্রোজেন বোমার সাথে যখন কোবাল্ট ৬০ হবে যুক্ত তখন সারাপৃথিবী মহাশ্মশানে পরিণত হবে। এক্সরে থেকে প্রায় ১০,০০০ গুণ শক্তিশালী হোল কোবাল্ট ৬০ রেডিয়ামের 'গামা' রশ্মির সাথে কোবাল্ট ৬০-এর তুলনা করা চলে, ক্যানসার প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ থেকে রোগীকে বাঁচাতে হলে কোবাল্ট রশ্মি আজ বিশেষ প্রয়োজন। চিকিৎসা ছাড়া কলকারখানা শিল্পউন্নতির পথে কোবাল্ট রশ্মিকে নানাভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। আজ যখন আমরা প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আহরণ করে পৃথিবীও মানবসমাজকে আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে সক্ষম সেই সময় সমাজের ওপর-তলার একমুঠো লোক এই বিরাট শক্তিসম্পদকে মারণযন্ত্রে নিয়োজিত করে সমস্ত মানবজাতিকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করছে। Max Plank Society-এর সভাপতি অধ্যাপক Otto Hahn সম্প্রতি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তিনি এক প্রবন্ধে বলছেন—

"A mad or power-crazed dictator, taking as his motto "après nous le déluge," might sentence the civilised world, and his own country with it, to death by radiation."

আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা আগুন নিয়ে খেলছেন। আণবিক শক্তির উদ্ঘাটনের পর পৃথিবীর ইতিহাস এক বিপুল পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে। শান্তির ও মানবকল্যাণের

পথে আণবিক শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে এই পুরোনো পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তর হবে। আরেকদিকে কলওয়ালাদের কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখবার মতলবে এই শক্তিদানবকে সাম্রাজ্যবাদী লড়াই-এর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় তবে সারা পৃথিবী আত্মঘাতী ধ্বংসের আগুনে জ্বলে উঠবে।

অনাদি কাল থেকে এই পৃথিবীতে প্রতিদিন পূর্বগগনে প্রভাত সূর্য উদয় হয়েছে, সন্ধ্যারাগে পশ্চিম প্রান্তে নিজেকে ধীরে ধীরে আত্মগোপন করেছে। নিশীথ আকাশে আলোর প্রদীপ নিয়ে অসংখ্য তারকার দল সমবেত হয়েছে। প্রকৃতির এই চিরন্তন লীলাকে মানুষ এসে তার রহস্যকে উদ্ঘাটন কোরল, অন্তরে অনুভব কোরল তার সৌন্দর্যকে, রূপ দিল তার কাব্য ও ছবিতে। আজ লক্ষ বছর অতীত হতে চলল মানুষের আবির্ভাব হয়েছে এই পৃথিবীর বুকে। এই ক্ষণকালের ভিতরে যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস মানুষের ধারা বহন করে চলেছে আজ সেই ধ্যানতপস্যালব্ধ সভ্যতা কতিপয় লোকের স্বার্থের ইন্ধন জোগাতে এক নিমিষে বিলুপ্ত হয়ে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে? শুধুমাত্র বাঁচবার দাবী নিয়ে লক্ষলক্ষ মানুষ এই আত্মঘাতী ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করবার জন্য সম্মুখে এগিয়ে আসবেনা? আজ এই প্রশ্ন বারবার সবার চোখে ভেসে উঠছে।

সনৎকুমার রায়চৌধুরী

উন্নাসিকতা প্রসঙ্গে

বাঙালী বুদ্ধিজীবির উন্নাসিকতার দুর্নাম রীতিমত বনেদী। কিন্তু ইদানীং যেন এই প্রবণতার বড় বাড়াবাড়ি চোখে ঠেকছে। ক্ষমতার সঙ্গে বা জ্ঞানের সঙ্গে, যে বিনয়, যে সার্বজনীন দরদ আমাদের জীবনধারার একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল, তা' আজ প্রায় অদৃশ্য। নিজের জ্ঞান বা শিক্ষা আর নিজের জীবন বা চারধারকে আলোকিত করার সম্বল নয়, এই মহৎ সম্পদগুলি আজ আমাদের প্রচারসচিব মাত্র। অন্যকে হেয় তথা নস্যাৎ করে নিজের অসাধারণত্বকে প্রচার করাই আধুনিক বাংলাদেশে অনন্য হবার সুলভতম পন্থা। এযুগের সাহিত্য লক্ষণীয়ভাবে মলাট-নির্ভর; সাময়িকপত্রের প্রবন্ধের, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্রের কৌলিন্যও তথ্য বা তত্ত্বের চাইতে উদ্ধৃতি এবং গ্রন্থপঞ্জীর দৈর্ঘ দিয়েই মাপা হয়। বই পড়া, বোঝা বা স্বীয় চিন্তাধারায় অঙ্গীকৃত করা নয়—বন্ধু বা পরিচিত মহলে তাদের নাম উচ্চারণ করে নিজেকে উন্নততর জীব বলে প্রমাণ করাই বাঙালী বুদ্ধিজীবি সমাজের একাংশের বৈশিষ্ট্য। গত দুইদশকে নিঃসন্দেহে সাময়িকপত্র এমন কি দৈনিকগুলিরও সমালোচনা বিভাগের কলেবর ও জনপ্রিয়তা বেড়েছে; কিন্তু তা' সমালোচিত বইগুলির সঙ্গে পরিচয়ের সোপান হিসেবে নয়; তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় এড়িয়েও নিজেকে রুচিবান তথা পণ্ডিত বলে জাহির করার সহায়করূপে। মার্গসঙ্গীতের আসরে ভিড় বেড়েছে অবিশ্বাস্যরকমে—কিন্তু তাদের মধ্যে একটা বৃহৎ অংশেরই ঝোঁক রসগ্রহণের চাইতে নিজেকে রসজ্ঞ বলে প্রতিপন্ন করার দিকে।

এই মানসিক ব্যাধিটির অস্তিত্ব যে আগেও ছিল না, তা নয়। কিন্তু আজ এর প্রসার রীতিমত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এর চিকিৎসাপদ্ধতি বাৎলান সহজ নয়,—'সমাজসমস্যা'র ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভবও নয়। কিন্তু কারণ নির্ণয় যেহেতু চিকিৎসার অর্ধাংশ, সেজন্যই এর কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিজীবি উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সমাজের উন্নাসিকতা একটি স্বাশ্রয়ী উৎপাতমাত্র নয়—এর শেকড় আমাদের সামাজিক চরিত্রের গ্লানি ও অসামঞ্জস্যের গভীরে বিসর্পিত।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে নিজেকে বিশিষ্ট বলে প্রমাণ করার আকাঙ্খা মানুষের অন্যতম মৌল তাগিদ। কিন্তু সভ্যতা এই তাগিদকে সুষ্ঠু, সুন্দর এবং সমাজসংহতির সহায়ক করতে চায়। মানুষের পশুসত্তা অন্যকে দাবিয়ে, ত্রস্ত করে আত্মপ্রাধান্য সৃষ্টিতে প্রয়াসী—কিন্তু দমন বা পীড়নের ওপর নয়, শ্রদ্ধা নির্ভর ভালবাসার ওপরেই মানবিক সহযোগের ভিত্তি। সমাজসংহতির প্রয়োজনে মানবসভ্যতা তার যাত্রাপথে তাই প্রাধান্যসৃষ্টির, নতুন নতুন পথ খুলে দিয়েছে—শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, মানবসেবা, কল্যাণমূলক প্রয়াস—সবই আত্মপ্রাধান্যের আকাঙ্খাপূরণ করার সভ্যতর এবং সুন্দরতর পন্থা। দমন বা পীড়নের পাশবিক পদ্ধতির সঙ্গে এইসব পদ্ধতির পার্থক্য মূলতঃ শেষোক্তদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেদনে। সাহিত্য, শিল্প বা বিজ্ঞানের

সাধকদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা নিজের থেকেই সহস্রধারায় উৎসারিত হয়ে উঠেছে—তাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা না করলেও, আমরা নিজ থেকেই তাদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছি। সেজন্য চাবুকের দরকার হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনশীল ভিত্তিতে এক এক স্তরের সমাজে আত্মপ্রাধান্যের এক একটা মূল অবলম্বন গড়ে ওঠে। প্রাক্-সভ্য সমাজে দৈহিক বলই ছিল প্রাধান্যসৃষ্টির প্রধানতম পন্থা; পরবর্তী কৌমযুগে, প্রকৃতির কোপ থেকে বাঁচাতে পারার অলৌকিক ক্ষমতা (যথা—ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র, তন্ত্র ইত্যাদি) এবং শত্রুকৌমের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা তথা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতাই ছিল প্রাধান্যলাভের শ্রেষ্ঠ সোপান। দাস সমাজে দাসের সংখ্যা এবং সামন্তসমাজে ভূমির পরিমাণ ছিল নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের বিশিষ্ট মাপকাঠি। আর এযুগের ধনতন্ত্রী সমাজে কাঞ্চনকৌলিন্য-ই যে সবচেয়ে বড় কৌলিন্য-লক্ষণ এ তত্ত্বও সর্ববাদীসম্মত।

সামাজিক ইতিহাসের অনিসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেই জানেন যে, সভ্যতার প্রতি স্তরেই যে শুধু প্রাক্তন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ টিকে যায় তাই নয়, অনাগত স্তরের প্রাগ্রসর সম্ভাবনাও বীজাকারে সব সভ্যতার মধ্যেই বর্তমান থাকে। ধনতন্ত্রের পরবর্তীস্তরের রূপ দেশভেদে বিভিন্ন হতে পারে; কিন্তু আধুনিক চিন্তাবিদদের এক সুবৃহৎ গরিষ্ঠাংশই এ সম্বন্ধে একমত যে তা' হবে সমাজকল্যাণের ওপর নির্ভরশীল; অর্থাৎ, উৎপাদনের উপকরণগুলির সম্পর্ক, মালিকানা এবং ব্যবহারের প্রকৃতি তথা সমগ্রভাবে সামাজিক কাঠামোই সমাজহিতের সচেতন সংজ্ঞা দ্বারা নির্ধারিত হবে। এ তত্ত্ব স্বীকৃত হলে, আগামীযুগে আত্মপ্রাধান্যলাভের পন্থা সম্বন্ধেও আমরা আভাস পেতে পারি। অতীত বা বর্তমান যুগের মত সেই ভাবী সমাজে মানুষের মর্যাদা তথা বৈশিষ্ট্য তার দৈহিক শক্তি, অনুচরের সংখ্যা, ভূমি বা ধনসম্পদের ওপর নির্ভর করবে না,—তা হবে মূলতঃ সমাজের হিতের জন্য ব্যক্তির প্রয়াস কতদূর সৎ বা সার্থক তার ওপরে নির্ভরশীল। ভাবীকালের আভাসের মত আজকের এই কাঞ্চনকৌলিন্যের যুগেও তাই সমাজস্বীকৃত সভ্য, সুন্দর তথা হিতকর পদ্ধতিগুলির সার্থক ব্যবহারই প্রাগ্রসরতার লক্ষণ বলে স্বীকৃত। কিন্তু এই সময়ে বৈশিষ্টলাভের পদ্ধতি যদি উন্নাসিকতার পথেই সার্থকতা খোঁজে তবে তা' সমাজবিজ্ঞানীর পরিভাষায় সামাজিক পশ্চাদ্‌গামীতা বা Social regression বলেই অভিহিত হবে। উন্নাসিকতা নিজের বা অপরের বিকাশের জন্য আগ্রহী নয়, তার মূল লক্ষ্য অন্যকে বুদ্ধিকৌশলে বা জ্ঞানের কুচকাওয়াজে পর্যুদস্ত করা। এর সঙ্গে দৈহিক বলপ্রয়োগে প্রাধান্যসৃষ্টির কোন মূলগত পার্থক্য নেই। একে তাই একধরণের পশ্চাদ্‌গামীতা বলে অনায়াসেই অভিহিত করা চলে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠবে আমাদের দেশে যখন বৈষয়িক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রয়াস চলেছে, তখন বুদ্ধিজীবি মনস্তত্ত্বে এই পশ্চাদ্‌গামীতার কারণ কি? এর উত্তর দিতে হলে শুধু সমকালীন ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই চলবে না, অতীতের দিকেও তাকাতে হবে।

গ্রামবাংলার সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় জমির মালিকানা ছিল সামাজিক মর্যাদার প্রধান মানদণ্ড। ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ অর্থনীতি প্রসারমান জনসংখ্যাকে যখন আর আশ্রয় দিতে পারেনি, তখন থেকেই গ্রাম ছেড়ে সহরের দিকে জনস্রোত বইতে সুরু ক'রেছিল। গ্রামীণ মধ্যবিত্তসমাজ (অর্থাৎ স্বল্প আয়ের ভূম্যধিকারী, ছোট মধ্যস্বত্বভোগী বা সম্পন্ন কৃষিজীবি) গ্রাম্য অর্থনীতির সংকুচিত পরিধিতে তাদের উচ্চাকাঙ্খা তথা সামন্ততান্ত্রিক প্রধানগোষ্ঠির অনুরূপ মান বজায় রাখা অসম্ভব দেখে বৃটিশ আমলের গোড়া থেকেই নাগরিক বাণিজ্য বা সরকারী কাজে নিজেদের

স্থান খুঁজে নিচ্ছিল। সরকারী আমলা বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক কর্মচারী হবার জন্যই এদের প্রথম আধুনিক শিক্ষার দিকে ঝুঁকতে হয়েছিল। বাংলার রেণেসাঁর পুরোধা এরাই। কিন্তু প্রতিহত সামন্ততান্ত্রিক আকাঙ্খা এদের মানসিক গঠনকে চিরদিনই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাঙ্গালী নাগরিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবির নৈতিক-সাংস্কৃতিক মূল্যকাঠামো তাই ঐতিহাসিকভাবে সামন্ততান্ত্রিক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে যাদের অধীনে এদের কাজ করতে হল তারাও (অর্থাৎ ইংরেজ অফিসার বা বণিক) মূলতঃ স্বদেশে নিজেদের আকাঙ্খাপূরণের যথাযোগ্য পথ না পেয়েই এদেশে এসেছে। তাদের অবরুদ্ধ বাসনাকামনা এদেশে বিলাসিতা, আত্মম্ভরীতা, ও অধীনস্থ পীড়নের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। এই বিকৃত প্রভাবও বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবির মানসিক কাঠামো গঠনে কম কাজ করে নি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের বুদ্ধিজীব সমাজের এক বৃহৎ অংশের মানসিক পরিমণ্ডলে ইয়োরোপীয় উদারনীতিবাদ বা মানবতাবাদ মূলতঃ আচড়ই কেটেছে — গভীর প্রভাব যে বিস্তার করতে পারে নি, তার মূলে এই ঐতিহাসিক কারণগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কিন্তু আমাদের বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনে সংকট গভীর না হয়ে ওঠা পর্যন্ত এই বিকৃতিগুলি মোটামুটি ভাবে চাপা পড়েছিল। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের দ্রুত অবক্ষয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দেশবিভাগ এবং যুদ্ধোত্তর শিল্পায়ন প্রয়াসের ফলস্বরূপ অবশ্যম্ভাবী সামাজিক আর্থিক চাপ আমাদের মানসিক দিগন্তে নতুন সংকটের সৃষ্টি করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আমাদের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর দ্রুত অবক্ষয় এবং উৎপাদন ও বন্টনসম্বন্ধগুলির ধনতান্ত্রিক রূপায়ন সুনিশ্চিত ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। বংশমর্য্যাদা, ভূসম্পত্তি, বৈবাহিক সম্পর্ক ইত্যাদি সামাজিক মর্য্যাদামানগুলিকে সবলে উৎখাত করে অর্থকৌলিন্যই ক্রমশঃ সামাজিক শক্তি ও মর্য্যাদায় প্রধান পরিমাপ হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু সেদিনের ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অনুন্নত বৈষয়িক কাঠামোর ক্ষুদ্র পরিধিতে বুদ্ধি সম্বল নাগরিক মধ্যবিত্তের অর্থকৌলিন্য লাভের সুযোগ কোথায়? এই অভাব ও ব্যর্থতাই মধ্যবিত্ত মনে হতাশ ও ক্ষোভের মধ্য দিয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল।

এ সমস্যাকে আরও অসহনীয় করে তুলল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ ও যুদ্ধোত্তর বৈষয়িক সমস্যার গুরুভার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আনুসঙ্গিক মুদ্রাস্ফীতি বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে দিয়েছিল। যেটুকু বাকী ছিল তাও পূর্ণ করল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও সমাজজীবনের ওপর দেশবিভাগের কঠিন আঘাত। এর ওপর দ্রুত শিল্পায়নপ্রয়াসের ফলে অনিবার্য্যভাবে দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর যে চাপ পড়ছে তা, এবং উন্নয়নপ্রয়াসজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আঘাতও অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবির পক্ষে। তার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা আজ প্রাক-যুদ্ধ যুগের তুলনায় অনেক খারাপ, অথচ সামাজিক মর্য্যাদামান ও মূল্যকাঠামোর পরিবর্তনের ফলে উন্নততর জীবনের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা আজ তার কাছে আগের চেয়ে অনেক বেশী পীড়াদায়ক। অবস্থা আরও অসহনীয় হয়ে উঠেছে, অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে Demonstration effect বলা হয়, তার জন্য যুদ্ধকালীন, যুদ্ধোত্তর ও উন্নয়নকালীন মুদ্রাস্ফীতি একদিকে যেমন বাঁধা আয়ের মানুষ বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছে, অন্যদিকে আবার মুদ্রাস্ফীতির স্বাভাবিক নিয়মেই এর ফলে শিল্পপতি ও বণিক শ্রেণীর অবস্থা আজ আগের চেয়ে অনেক বেশী স্বচ্ছল*। এদের স্বচ্ছলতা লক্ষণীয়ভাবে প্রকট হয়েছে বিলাসসামগ্রীর ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধোত্তর যুগে এদেশের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ

বেড়েছে অনেক বেশী — আর তারই ফলে বিদেশের উন্নততর জীবনযাত্রা অনুকরণ করার আগ্রহে সিতার প্রভাব বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্তের মনের ব্যর্থতাকে আরও অসহ্য করে তুলেছে। এই ব্যর্থতা আমাদের সম্পদশালী লোকেদের বিলাসব্যয় বেড়েছে বহুগুণে। আর তাদের ক্রমবর্ধমান বিলাসিতার প্রভাব বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্তের মনের ব্যর্থতাকে আরও অসহ্য করে তুলেছে। এই ব্যর্থতা ও হীনমন্যতাই বুদ্ধিজীবি সমাজের পশ্চাদগামীতার জন্মদাতা। সমকালীন সমাজের মর্য্যাদামান অনুযায়ী আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা অসম্ভব; ওদিকে আমাদের পঙ্গু ও অসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবির মানসিক সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিকেও এমন স্তরে নিয়ে যেতে পারে নি, যাতে বিশ্বসংস্কৃতি ভাণ্ডারে নতুন অবদান যোগ করে উন্নততর পদ্ধতিতে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা চলে। যেখানে দাঁড়াতে হ'ল সেখানে স্থানাভাব, আবার এগোবার পথও বন্ধ — এ অবস্থায় যে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবির মানসিক স্তরে পশ্চাদগামীতা প্রকট হয়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কাঞ্চনকৌলিন্যের যাদুমন্ত্রে অন্যকে অভিভূত করা গেল না; নিজের মনেও এমন আলো নেই যার প্রভায় অন্যের মনকে জয় করা চলে — একমাত্র পথ তাই আদিযুগের পূর্বপুরুষের মত অন্যকে ত্রস্ত করে তোলা। গায়ের জোরে তা আর সম্ভব নয় — বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি তাই বক্রপথ নিয়েছে। সেই পথই উন্নাসিকতা — অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রায়ান্ধ দেশে, নিজের জ্ঞানবিদ্যার মিথ্যা চাকচিক্যে অন্যের মন বিভ্রান্ত করা। যে আলো দিয়ে পথ দেখান চল্‌ত, তাকেই লাগান হচ্ছে ক্ষীণদৃষ্টি লোকের চোখ ধাঁধানোর কাজে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এর চাইতে বেদনাদায়ক দুর্ভাগ্য বোধহয় আর কিছুই নেই।

সুব্রতেশ ঘোষ

---

* মুদ্রাস্ফীতির সময়ে পণ্যমূল্য অবিশ্বাসারকম দ্রুতগতিতে বাড়ে; কিন্তু বেতন, সুদ, খাজনা প্রভৃতি পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট উৎপাদন-খরচগুলি সমতালে বাড়তে পারে না বলে, শিল্পপতি ও বণিকদের লাভ বহুগুণে বেড়ে যায়।

স মা লো চ না

THE NEW CLASS: Milovan Djilas. Frederick A. Praeger Inc., New York 36, S 3.95.

'নিউ ক্লাস' একটি অপূর্ব সমাজ বিশ্লেষণ। এ যেন কোন ঊর্ধ্বমুখী বিদেহী আত্মা তার ফেলে-আসা নশ্বর দেহকে খণ্ড খণ্ড করে নিজের অতীত জীবন-তত্ত্ব দেখিয়ে দিচ্ছে। পড়তে পড়তে মনে হয় তার নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণের মধ্যেও যেন একটা স্বতঃউৎসারিত আবেদন ভেসে আসছে, কে যেন বারে বারে বলে চলেছে — 'যে মরে গেছে তাকে কবর দাও; নইলে কেবল দুর্গন্ধে সমাজ-জীবন দুঃসহ হয়ে উঠবে তা নয়, মড়ক ছড়াবে।'

শ্রেণীহীন, সুখী ও স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে যাঁরা একদিন কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মিলোভান জিলাস অন্যতম। কমিউনিজমের মোহভঙ্গের অভিজ্ঞতা বর্ণনা আধুনিক জগতের একটি মূল্যবান জবানবন্দী। কোয়েস্লার, সিলোনে, রাইট, জিদ্, ফিসার, স্পেন্ডার, এবং সর্বশেষ হাওয়ার্ড ফাস্ট পর্যন্ত সেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় আর্তনাদ করে উঠেছেন, সৃষ্টি হয়েছে কত কবিতা, গান, উপন্যাস ও রকমারী সাহিত্য, কিন্তু জিলাসের **'নিউক্লাস'** সেদিকে যায়নি। জিলাস কেবল কমিউনিজমের ভাববেগে ভেসে যাননি, তিনি ছিলেন তার অন্যতম ইঞ্জিনিয়ার ও পরিচালক। কমিউনিষ্ট যন্ত্রের কলকব্জা ও প্রতিটি খুঁটিনাটির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়। তিনি তার দেহ-তত্ত্ব ও প্রাণ-প্রবাহের ধারা বিশ্লেষণ করে কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থার মর্মমূলে আঘাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কমিউনিজমের মধ্যে থেকে কেবল একটি 'নতুন শ্রেণীর' অভ্যুদয় হয়েছে তা নয়, এই শ্রেণী তার বাঁচবার দায়ে দেশের ও বিশ্বের সমূহ সর্বনাশ নিয়ে আসতে পারে। বিশ্বের কোন শ্রেণী ইতিপূর্বে এতখানি ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেনি। ধনবাদী সমাজে কায়েমী স্বার্থকে আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্য রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করতে হয়। সেখানে ক্ষমতা, মালিকানা ও আদর্শবাদ অখণ্ড নয়। কিন্তু কমিউনিষ্ট সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতা, সম্পত্তির মালিকানা ও সমাজের আদর্শবাদ সবই সরকারের হাতে, এবং তার ফলে যারা সেই সরকার পরিচালনা করেন তারাই প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার উৎস, সম্পত্তির মালিক ও সামাজিক আদর্শের পুরোহিত হয়ে পড়েন। এখানে পার্টিই সর্বেসর্বা। শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজনে একসময় এখানে পার্টি সংগঠন সুদৃঢ় করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। শিল্প-বিপ্লবের আদর্শই ছিল তখনকার পার্টির সব চেয়ে বড় শক্তি। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের পথে গণতন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে বিপ্লবান্তে সেই পার্টি হয়ে উঠল শিল্প প্রাচুর্যে পয়লা নম্বর শোষক। সাধারণ মানুষকে কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যদের উচ্ছিষ্ট খেয়েই কালাতিপাত করতে হয়। কোন প্রকারে অসন্তোষ প্রকাশিত হয়ে পড়লেই তাদের প্রতিক্রিয়াশীল বা দেশদ্রোহী হিসাবে সর্বপ্রকার দুর্ভোগের সম্মুখীন হওয়া অনিবার্য। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণের মতামত প্রকাশের বা সরকারের বিরোধিতা করার স্বাভাবিক কোন ব্যবস্থা না থাকাতে হয় নিষ্ক্রিয়তা, নয়তো রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সমাজকে উঠা-নামা

করতে হয়, এবং তাতে অন্যান্য ক্ষতি ছাড়াও সমাজের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়। জিলাস দেখিয়েছেন, কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থায় এর অন্যথা হবার উপায় নেই। এমন কি স্বয়ং স্তালিনের ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব হতনা কারণ এটা কমিউনিষ্ট সমাজ সংগঠনেরই অনিবার্য পরিণতি। কমিউনিষ্ট সমাজ সংগঠন ও কমিউনিষ্ট সমাজের 'নতুন শ্রেণী'র ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নেতা যত বড়ই হোন না কেন, শ্রেণীর বাইরে যাবার ক্ষমতা তার নেই, শ্রেণী-স্বার্থই বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ ও নেতা পরিবর্তনের প্রেরণা জুগিয়েছে, ক্রুশ্চেভের স্তালিন বিরোধিতার কারণও এইখানে। এতে কমিউনিজমের শ্রেণী ভিত্তির কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং পরিবর্তিত পরিবেশে সেই শ্রেণীর স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করার জন্য কমিউনিষ্টদের এই প্রচেষ্টা। জিলাস দেখিয়েছেন কমিউনিষ্টদের পরমত-অসহিষ্ণু আদর্শবাদেই এই শ্রেণীর সম্ভাবনা নিহিত ছিল। এখানে তিনি শ্রেণীর বস্তুতন্ত্র নিরপেক্ষ ভিত্তির কথা তুলে ধরেছেন, সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে যেমন শ্রেণী গড়ে উঠতে পারে, আদর্শের একদেশদর্শীতার মধ্যে দিয়েও সে শ্রেণী সৃষ্টি হতে পারে। তিনি দেখিয়েছেন, শিল্প-বিপ্লবের প্রেরণা নিয়ে কমিউনিষ্ট একনায়কত্ব সৃষ্টি হলেও শিল্প-বিপ্লবের পর আজ সেই কমিউনিষ্ট একনায়কত্ব শিল্প-সম্প্রসারণ ও আর্থিক উন্নয়নের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। দেশে দেশে কমিউনিজম আজ এই স্ব-বিরোধী দোলায় দুলছে, কিন্তু আর বেশী দিন এইভাবে চলা সম্ভব হবে না। এই স্ব-বিরোধিতার ফলে কমিউনিজমের ভিত্তিমূলে ফাটল দেখা দিয়েছে। শিল্প-বিপ্লব সৃষ্টির পথে কমিউনিজম বিচ্ছিন্ন শ্রমিক সৃষ্টি করেছে। বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যৌথ-নেতৃত্বের মধ্যে দিয়ে "নতুন শ্রেণীর" অস্তিত্ব রক্ষার যতই চেষ্টা হোক না কেন, কমিউনিষ্ট শিল্প-বিপ্লবই কমিউনিজমের সমাধির পথ প্রশস্ত করে তুলেছে। "জাতীয় কমিউনিজম" সেই মহা সংকটেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কমিউনিষ্ট তাবেদারী রাজ্যগুলি মস্কোর আধিপত্য চায় না সত্যি, কিন্তু আপন আপন দেশে তারা তাদের "নতুন শ্রেণীটিকে" বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু এ দুরাশা। অবস্থার তাগিদে জাতীয় কমিউনিজমকে ক্রমে অধিকতর পরিমাণে জনসাধারণের অভাব অভিযোগের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। শিল্প-বিপ্লব স্বাধীনতাকে আর্থিক উন্নয়নের উপাদান করে তুলেছে, এই অবস্থায় অকমিউনিষ্ট রাজ্যের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি মহা মুস্কিলে পড়েছে। এতদিন তারা সূর্যমুখী ফুলের মত মস্কোর দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু সেখানে আজ প্রাসাদ-বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। স্তালিনের মত ব্যক্তিত্ব আজ সেখানে কেবল নেই তা নয়, ভবিষ্যতেও হবার সম্ভাবনা নেই। স্তালিনের একটি ভূমিকা ছিল। শত নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও স্তালিন দেশকে শিল্প-বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু স্তালিনোত্তর "নতুন শ্রেণী" কিসের জোরে সাধারণের উপর নিজেদের শোষণ ও আধিপত্য বজায় রাখবে? কেবল কি "যৌথ-নেতৃত্বের" কথা ও স্তালিনের "দুর্নীতি" কীর্তন করে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতাস্পৃহা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষুধা নিবৃত্তি করা সম্ভব হবে? রুশ নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই নির্বীর্য হয়ে পড়েছে। কেবল যুগোশ্লাভিয়ার বিদ্রোহ নয়, কমিউনিষ্ট চীনের স্বাধীনতাকে রাশিয়ার স্বীকার করে নিতে হয়েছে। ক্রুশ্চেভের মুখে আমরা শুনতে পাই স্তালিন চীনকেও যুগোশ্লাভিয়ার পথে ঠেলে দেবার উপক্রম করেছিলেন। স্তালিনোত্তর রাশিয়া তাই তার "নতুন শ্রেণীর" অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভেতরে বাইরে নরম সুর গাইতে বাধ্য হয়েছে। কেবল যুগোশ্লাভ ও চীনের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য অকমিউনিষ্ট রাজ্যগুলির কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকেও অধিকতর স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছে। এতে অকমিউনিষ্ট রাজ্যগুলির সুবিধা ও অসুবিধা দুই বেড়ে গেছে। সুবিধা এই, গণতান্ত্রিক পরিবেশে তারা জনগণের

মতামত অনুযায়ী পার্টি-নীতি নির্ধারণ করতে পারবে, কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে, কমিউনিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করতে গেলেই জনসমর্থন হারাবে। এইভাবে ঘরে বাইরে কমিউনিজম আজ তার স্ববিরোধী সংঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। পদ্ধতি হিসাবে কমিউনিজমের পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

কালমার্কস ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণ করে কমিউনিজমের অনিবার্য আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করেছিলেন। জিলাস কমিউনিজমের বিশ্লেষণ করে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মানব জাতি ক্রমাগত ঐক্যের দিকে ছুটে চলেছে, কিন্তু এই ঐক্যের জন্য বৈচিত্রহীনতার কোন প্রয়োজন নেই, প্রকৃতপক্ষে তা কাম্যও নয়। বিশ্বকে আতলান্টিক বা সোভিয়েত নকসায় সাজাতে হবে এমন কোন কথা নেই। পরন্তু বিচিত্র সমাজ-পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মিলন হতে পারে। কিন্তু এই পথে কমিউনিজমের একদেশদর্শী আদর্শবাদ ও একনায়কত্ব সব চেয়ে বড় আপদ। কমিউনিজমের পক্ষপুষ্ট সম্প্রসারিত "নতুন শ্রেণীর" আপন স্বার্থেই এই মহামিলনের পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। সমাজ-ব্যবস্থা যাই হোক, আর্থিক পরিকল্পনা আজ সকলেই গ্রহণ করেছে। এমনকি আমেরিকায়ও এই পরিকল্পনা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু আজকে সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, সেই পরিকল্পনায় জনসাধারণের কতটুকু কর্তৃত্ব রয়েছে। মানুষ কতটুকু স্বাধীন, এই মানদণ্ডেই আজ সমস্ত পরিকল্পনার পরিমাপ করতে হবে। এ যুগে স্বাধীনতাই মানবসভ্যতার সব চেয়ে বড় সমস্যা।

"নিউ ক্লাস" একটি অসাধারণ গ্রন্থ। কলেবর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলেও একে অনায়াসে 'ডাস ক্যাপিট্যালের' সঙ্গে তুলনা করা চলে। ওয়েলথ অব্ নেশান, ডাস ক্যাপিট্যাল ও নিউ ক্লাস সম্ভবতঃ আধুনিক যুগের তিনটি মাইল ষ্টোন। কমিউনিষ্ট ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে : থিসিস্, এন্টিথিসিস্ ও সিন্থেসিস। এ যুগে "নিউ ক্লাসই" মানব মনে আধিপত্য করবে। ধনতন্ত্র ভেঙ্গে পড়েছে. কমিউনিজম ভেঙ্গে পড়ছে। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রই এ যুগের আশাবাদী মানুষের মনে নতুন দিক্ খুলে দিয়েছে। কমিউনিষ্ট লৌহ যবনিকার অন্তরালেও যে মানুষ সেই সমাজ বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছে, জিলাসের "নিউ ক্লাস" তারই জ্বলন্ত জবানবন্দী। এজন্য তাঁকে আজ চরম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হচ্ছে। এই বইএর জন্য তাঁর আরও সাত বৎসর বেশী সাজা হয়েছে। জিলাসের আত্মীয়-পরিজনও এইজন্য দুর্ভোগ ভোগ করছেন। কমিউনিষ্ট রাজ্যের শোষক শ্রেণীর কাছে জিলাস হয়ে উঠেছেন একটি জ্বলন্ত দুর্গ্রহ। কিন্তু যে আগুনে কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থা ভেতর থেকে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে জিলাসকে নির্বংশ করেও তার নিরসন সম্ভব হবে না। কারণ এ কোন ব্যক্তিবিশেষের বিদ্রোহ নয়। কমিউনিজম তার বাড়তির পথেই এই ক্ষয়ের খাদ সৃষ্টি করে গেছে। জিলাস অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত সেই সমাজদেহের সংগঠন ও গতি প্রকৃতি দেখিয়েছেন মাত্র। পরিশেষে প্রাক্তন সহকর্মীদের উদ্দেশ করে তিনি বলেছেন, তারা যদি বিশ্বকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করার সাহস রাখে, তাহলে কমিউনিষ্ট হিসাবে তাদের পরাজয় ঘটতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসাবে তাদের জয় সুনিশ্চিত। পশুশক্তি বা যে কোন মতবাদের চেয়ে প্রকৃত অবস্থার শক্তি অনেক বেশী, জীবনের জোর অনেক বেশী শক্তিশালী। সমগ্র বিশ্ব বৃহত্তর ঐক্য, প্রগতি ও স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে চলেছে। এ জলতরঙ্গ রোধ করার ক্ষমতা কারও নেই।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

CENTENARY SOUVENIR OF THE INDIAN WAR OF INDEPENDENCE: Sankar Sen Gupta, (Editor), Indian Publications, 3, British Indian Street, Calcutta-1. Price Rupees five only.

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ প্রথম জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কিনা এ নিয়ে মত পার্থক্য বর্তমান। এ বিদ্রোহের প্রধান নায়ক নায়িকাগণ জাতীয় মুক্তি কামনায় না নিজেদের স্বার্থে সংঘাতজনিত ক্ষোভে বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন এ বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা হয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে বলা চলে ১৮৫৭ সালেই প্রথম বিদেশী শাসক শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল অভ্যুত্থান ঘটে—যা পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপী, কুন্ওয়ার সিং, লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ বীর যোদ্ধারা পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর যোদ্ধাদের নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং এ দিক থেকে বিচার করেও ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে প্রথম জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ বলে অভিহিত করা যায়।

কিন্তু এ মহাবিদ্রোহের বিশেষ কোন পূর্ণাঙ্গ নিরপেক্ষ ইতিহাস কয়েক বছর আগেও রচিত হয় নি। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের অনেকেই এ বিদ্রোহের প্রতি পক্ষপাতহীন মনোভাবের পরিচয় দেননি। ইংরেজ শাসক শ্রেণীর সূত্রে প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যের ওপর নির্ভর করে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনাও হয়ত সম্ভব ছিল না। ভারতীয়দের রচিত স্বল্পকটি গ্রন্থও নিতান্ত নিরপেক্ষ বলা চলে না। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এই মুক্তি সংগ্রামের বিশদ নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ভারত সরকারের দলিল পত্রের প্রধান সংরক্ষক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের "১৮৫৭" এ রকম একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

আলোচ্য গ্রন্থটিও ১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থানের নানা তথ্যসম্বৃদ্ধ বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সমষ্টি। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল নেহরু, কে, এম, পানিক্কর, বীর সাভারকর, মৌলানা আজাদ, ডাঃ এম, এল, রায়চৌধুরী, অশোক মেহতা, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ বিশজন মনীষীর রচনায় গ্রন্থটি সম্বৃদ্ধ, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের বিভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, ইতিহাসের ছাত্র এবং এই বিদ্রোহের বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেই বইটি পড়ে লাভবান হবেন, বিশেষতঃ তিনজন বিদেশীর রচনা—গাই. এ. আলড্রেড্, পি, শাশাটিট্কো, টিংগ্-সে-লিয়াংগ্—গ্রন্থটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। পরিশেষের ঘটনাপঞ্জীর তালিকাটিও পুস্তকটির গুরুত্ব বৃদ্ধির সহায়তা করেছে। বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের সমাবেশে গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্যে সম্পাদক শ্রীসেনগুপ্ত বিশেষ প্রশংসার্হ।

পরিশেষে বলতে চাই গ্রন্থটিতে কয়েকটি প্রবন্ধ সমাবেশের যৌক্তিকতা অনুধাবণ করতে পারি নি। এ প্রবন্ধকটিতে রাজনীতিবিদের মামুলী বক্তৃতা ছাড়া কোন তথ্যের সমাবেশ ঘটেনি।

পুস্তকটির এখানে সেখানে কিছু বানান ভুল ও কিছু ছাপার ভুল চোখে পড়েছে। আশা-করি পরবর্তী মুদ্রণে এ ত্রুটী সংশোধিত হবে।

উৎপল চৌধুরী

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি। প্রিয়দারঞ্জন রায়। রত্নসাগর গ্রন্থমালা। দুই টাকা।

গ্রহে উপগ্রহে। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। রত্নসাগর গ্রন্থমালা। দেড় টাকা।

দূরকে করিল নিকট। জন জে ফ্রোহাটি।—অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ সরকার
এশিয়া পাবলিশিং কোং। দুই টাকা

তিনটি বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানের বই। প্রথম দুখানিতে বিজ্ঞানের তথ্য সন্নিবেশ করে তত্ত্ব খোঁজবার প্রচেষ্টা হয়েছে। সাহিত্যের ছাত্র বলে যাঁরা বিজ্ঞানকে চিরদিনই দূরে ঠেলে রেখেছেন তাঁদের জন্যেই এই সহজ বিজ্ঞানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বাংলা ভাষায়। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি গ্রন্থটিতে প্রথমে বিজ্ঞানের মূল্যতথ্য কটি যাচাই করে দেখানো হয়েছে ও পরে সংস্কৃতির সঙ্গে তার মিল ও দ্বন্দ্বগুলি ছোট ছোট প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অ্যাটম ও স্পুটনিক যুগের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে অনেক মনীষী বিজ্ঞানকে সংযত করে সৎপথে এবং মানব হিতার্থে নিয়োগ করতে বলেছেন। এই গ্রন্থখানিতে শ্রীযুক্ত রায় সেই মতেরই স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন।

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরস্পরের পরিপন্থী কিনা এই নিয়ে বিতণ্ডার অবকাশ নেই। বিজ্ঞানের নূতনতর আবিষ্কারের ফলে ক্রমশঃই এই চিন্তা জটিল হয়ে উঠেছে। "বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি" একদিকে যেমন সহজপাঠ্য অন্যদিকে তেমনিই যুগোপযোগী।

এতদিন আমরা নক্ষত্র লোকে যাবার একমাত্র উপায় জেনেছি যোগবলের গল্পে। মঙ্গল গ্রহে বা চন্দ্রালোকে জীবের অস্তিত্ব নিয়েও অনেক জল্পনা কল্পনা করেছি। অনেক গল্পও রচিত হয়েছে সেই কল্পনাকে ঘিরে। আজ কিন্তু স্পুটনিকের অভিযানকে কেন্দ্র করে অনেকেরই আশা হয়েছে "সশরীরে স্বর্গে যাবার।" কিন্তু কল্পনার পথ আর বাস্তবে অনেক তফাৎ। বিজ্ঞান শূন্যলোক সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যতটুকু জেনেছে তাকেই প্রয়োগ করে শূন্যে পরিভ্রমণের সীমা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে গ্রহে উপগ্রহে গ্রন্থটিতে। সহজ সরল ভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্যের কোঠায় উঠেছে।

রেডিও, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, টেলিভিশন ইত্যাদি যন্ত্র দূরত্ব জয়ের জন্য পরিকল্পিত হয়েছে। এইসব আবিষ্কার কাহিনীর একটি সরস বিবৃতি দিয়েছেন জন ফ্রোহাটি তাঁর "Men against Distance" গ্রন্থে। দূরকে করিল নিকট গ্রন্থটি এরই একটি যথার্থ বঙ্গানুবাদ। বই খানিকে সাধারণ আবিষ্কার কাহিনী বললে ঠিক হবে না। বক্তব্যের পরিকল্পনায় আর বিষয়ের অবতারণায় সর্বক্ষণই মনে হয় যেন এক রোমাঞ্চকর গল্প পড়ছি। বিজ্ঞানীদেরও যে আর দশটা সাধারণ মানুষের মত দারিদ্র্য আছে, ক্ষুধা আছে আর বিজ্ঞান অনুশীলনে যে এগুলো কতবড় বাধা তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে আর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার পেছনে যে রক্ত-মাংসের মানুষ আছে লুকিয়ে তার পরিচয়ও মিলবে। একখানি অনুবাদের যোগ্য বই। অনুবাদক, লেখকের লেখার সুর যথাযথ অনুসরণ করেছেন।

ব্যঞ্জনা ও কাব্য (২য় খণ্ড)— হরিহর মিশ্র। দুই টাকা
বাংলা নাটক— দেবকুমার বসু, তিন টাকা। রত্নসাগর গ্রন্থমালা। পরিবেশক—গ্রন্থজগৎ।

গ্রন্থ জগতের পরিবেশনায় সবরকমের বইই প্রকাশিত হচ্ছে। শ্রীহরিহর মিশ্র তাঁর ব্যঞ্জনা ও কাব্য গ্রন্থখানি পর পর তিনটি খণ্ডে লিখেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর দুইটি খণ্ড প্রকাশিত হল। আলোচ্য খণ্ডে আনন্দ বর্দ্ধন অভিনব গুপ্ত প্রবর্তিত ধ্বনিবাদের সার্থকতার আলোচনা করা হয়েছে।

একদিন অলংকার শাস্ত্র আলোচনা সংস্কৃত সাহিত্যের ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অধুনা এই প্রাচীন আলংকারিকদের মতামত গুলি জনসাধারণের পাঠ্যভুক্তি করার একটা আকাঙ্খা দেখা যাচ্ছে। শ্রীহরিহর মিশ্র ঠিক এই পথ বেছে না নিলেও অলংকার শাস্ত্রের নব্য টীকাকার হিসাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমখণ্ডের অনুরূপ আলোচ্য খণ্ডেও সংস্কৃত ও রবীন্দ্র কাব্যই তাঁর উদাহরণের বিষয় বস্তু। যদিও আরও দুএকটি বাঙ্গালীকবির উদ্ধৃতি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে কাব্য সমালোচনার যোগ্যতা নির্দ্ধারণের কষ্টিপাথর খুঁজতে গিয়ে জনসাধারণের সাহিত্য বিচার ক্ষমতার উপর অনাস্থা দেখিয়ে বলেছেন। "সাহিত্যিক সত্যবিচারের ক্ষেত্রে এই তথাকথিত জনমত যে একান্ত দুর্ব্বল মানদন্ড তাহাই আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।"—কথাটা সকলের পক্ষে বিচারসহ কিনা সেটা ভাববার কথা কিন্তু মত প্রকাশের বলিষ্ঠ ভঙ্গীকে সকলেই স্বীকার করে নেবেন।

বাংলা নাটক গ্রন্থ খানি আর একখানি সাহিত্যের বই। গত প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে বাংলা নাটকের সৃষ্টি হয়েছে। এই গ্রন্থে এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যতগুলি (১৮৫২ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত) নাটক লেখা হয়েছে তারই একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছজন বিশিষ্ট নাটারসিকদের ছটি প্রবন্ধও সংকলিত হয়েছে। দেবকুমার বসুর এই নাটক সংকলন প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসার দাবী রাখে। বইখানি সকলের কাছে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আদরণীয় হবে সন্দেহ নেই। এই সঙ্গে বাংলা ভাষায় প্রণীত যাত্রার তালিকা সংকলন করবার কথাও মনে হল। শিশিরকুমার তাঁর প্রবন্ধে ও ভূমিকায় এ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা সকলেরই প্রণিধান যোগ্য।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র